কবিতাসংগ্রহ



দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৬০

প্রচ্ছদশিল্পী : পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে । দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট । কলকাতা ৭০০ ০৭৩

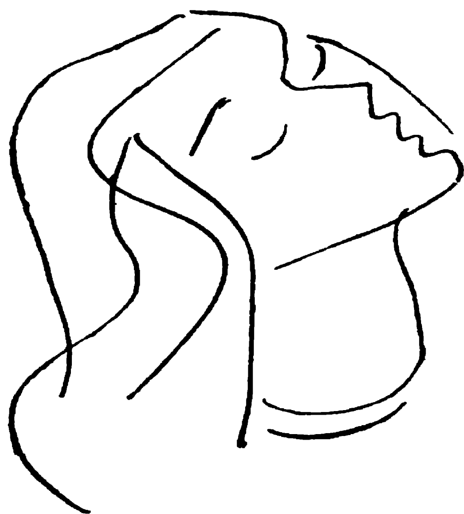
মুদ্রক : অরিজিৎ কুমার । টেক্‌নোপ্রিন্ট
৭ সৃষ্টিধর দত্ত লেন । কলকাতা ৭০০ ০০৬

সূচি

দুরন্ত দুপুর (১৯৫২)

কবিতাসংগ্রহ

দুরন্ত দুপুর



উ ৎ স র্গ



জননী

ও

জন্মভূমি

অলৌকিক

কলকাতায় বেঁচে আছি শুধু এই মহাপুণ্যবলে
এখনো গলির মোড়ে সন্ধ্যায়-সন্ধ্যায় গ্যাস জ্বলে,
ভোরে কলে জল আসে, পাশের বাড়ির
দ্বিতল রেলিঙে ঝোলে সদ্যস্নাত জাফরানী শাড়ির
আঁচলের প্রান্তভাগ। কী আশ্চর্য, প্রহরে-প্রহরে
পাড়ায় বস্তির কোণে রাত্রি ছিঁড়ে দস্যুতার স্বরে
কুঁকড়োর ঘোষণা ওঠে। ক্লান্তিহীন কী অধ্যবসায়,
একফোঁটা কালো মাছি দুপুরে বিরক্ত ক'রে যায়
ভন্‌ভন্ উড়ে-উড়ে। চায়ের উদ্বৃত্ত কিছু চিনি
খুঁটে তুলে নিয়ে যায় এক সার পিঁপড়ে প্রতিদিনই
নিপুণ নিষ্ঠায়। আর জানালায় দু'গজ আকাশ—
দু'গজ বেগনি নীল কমলা কি ফ্যাকাশে পাঙাস—
বারোমাস উপস্থিত। অন্ধকারে ফস্ ক'রে জ্বালো
সরু দেশলাই কাঠি,—ঘর ভরে মৃদু নীল আলো!
বিলিতি এ্যান্টিকে ছাপা সদ্য কিনে আনা কোনো বই
বুক ভ'রে গন্ধ দেয়, তাড়াতাড়ি সযত্নে লুকোই,
যেন কোনো প্রেমপত্র, বন্ধুদের লুব্ধ দৃষ্টি থেকে।
দিনে থাক, আলো জেলে রাত্রে পড়া যাবে চেখে-চেখে।
আর কী আশ্চর্য কাণ্ড, ছয় রাত্রি যেই হয় পার,
হাসিতে আটখানা মুখ ফিরে আসে লাল রবিবার,
ভাসমান লাল বয়া, ছয়দিন সমুদ্র সাঁতরিয়ে
জাহাজডুবির পর। এ-অলস রবিবার নিয়ে
মনে বুঝি, জীবিকার পশুটার লোমশ থাবায়
বিদীর্ণ হ'য়েও তবু শনিবার ঘরে ফেরা যায়
শিস দিয়ে। আর, ছাখো, চিঠির বাক্সটা যেই খুলি
রোজ কিছু চিঠি থাকে! অলৌকিক কে ডাকপিওন,
রেখে যায় রোদ্দুরের চৌকো খামগুলি!

কৃষ্ণচূড়া

কৃষ্ণচূড়া ! এখনো তুমি আছো ?
বৈশাখের রঙ্গালয়ে রঙ্গ শেষ হ'লো,
এখনো তুমি আপন মনে নাচো !
আকাশ আঁকে পুরনো পট, ধূসর ছায় ধরা,
এখনো তুমি বর্ণে মনোহরা ?
এখনো তুমি তুচ্ছ করো ধূলি !
এখনো তুমি পাথরে বাঁধা শহরে ফুটপাতে
বুলিয়ে দেবে চিত্তহরা তুলি !

কত বুকের কান্না, আর কত বুকের শাপে
ভেবেছিলেম ধরণী বুঝি রিক্ত হ'য়ে যাবে,
লুপ্ত হবে আকাশঝরা-আলোয়ভরা মাস ।
তোমার কানে যায় না কোনো রোদন, হতাশ্বাস ?
কোন সাহসে বুক বেঁধেছো, কোন দুরাশায় বাঁচো ?
কৃষ্ণচূড়া, কৃষ্ণচূড়া, এখনো তুমি আছো !

বাঁধা হরিণের গান

কামনা আমার প্রতি নিঃশ্বাসে
লেবরেটরির
ডকের
মিলের
মজুরির পাশে
খণ্ড টুকরো সুকোমল ঘাসে
লঘু পদপাত

ঘটে যেন,   রাত
কাটে যেন,   দিন
প্রীত হয়,   করি
হৃত-আশ্বাসে
নব আবাহন
প্রাণের মনের অবগাহনের
থাকে যেন সাধ
স্বপন ধারায়
থাকে যেন পণ
পদচারণের
মাছরাঙাদের   শালিক ফিঙের
ঘরোয়া পাড়ায়
যা বাঁচায় প্রাণ খুঁজি সেই গান সঞ্জীবনী
যা নাচায় মন খুঁজি অনুখন সে-খঞ্জনী।

এক বর্ষার বৃষ্টিতে

এক বর্ষার বৃষ্টিতে যদি মুছে যায় নাম
এত পথ হেঁটে, এত জল ঘেঁটে কী তবে হ'লাম ?

এত যে সয়েছি, এত যে পেয়েছি
দুঃখ-সুখের ধারায় নেয়েছি,
দুচোখে দেখেছি অপার্থিবের, অফুরন্তের ঝর্ণা,
প্রকৃতির রীতি, মানুষের ঘরকরনা :
মা'র কোলে শিশু ঘুমে অচেতন, চুলে বিলি দেয় হাওয়া,
একটি চুমোয় বিশ্বের সব খ্যাতি গৌরব বিত্তের স্বাদ পাওয়া,
ধিক্কারে ভরা নোংরা নরকে একটি কথার গানে
শতবার ফিরে জন্ম নেওয়ার অভিলাষ আনে প্রাণে।

সব আশা যদি চুরমার হয়, ভাঙে ফুলদানি, ভোরের চায়ের বাটি,
যে-পথে সে আর ফিরবে না, তবু আর একবার সেই পথ দিয়ে হাঁটি।
তৃষ্ণা মেটে না দেখে।
তবু শেষে জলে লিখে নাম
চ'লে যেতে হবে? কী তবে পেলাম, কী তবে হ'লাম?

চিরজীবীদের জয়টিকা আর অসামান্যের মাল্য
প্রতিজ্ঞা ক'রে কেটেছে একদা দেবদুর্লভ বাল্য।
ছিলো না শঙ্কা, মনের কোনায় সন্দেহ ক্ষীণ।
শিশু উল্লাসে হাওয়ায়-হাওয়ায় সে-আমার দিন—
রাঙা বুদ্বুদ—উড়িয়ে দিয়েছি চপল খেলায়।

আজ যৌবন খর জীবনের মধ্যবেলায়।

এখন দেখছি কত যে স্বপ্ন, কত যে ইচ্ছে
হ'লো না জীবনে পূরণ, কে তার হিসেব নিচ্ছে?
চ'লতে-চ'লতে নিজেই ভুলেছি—কত না দুপুর
কালো ভ্রমরের পাখায় এনেছে বহিয়া যে সুর!
লঘু প্রহরেব সে-সুর ছন্দে বাঁধার সময়
পেলো না হৃদয়।

দীর্ঘ গ্রীষ্ম কেটে গেছে কত—গানের চরণ।
চোখের সামনে জারুলের শাখা বেগ্‌নি বরণ
পুষ্পপ্রদীপে অপব্যয়ের যে-উদাহরণ
স্থাপন করেছে তা দেখে আমার হৃদয় জানতো
—আমারো তা হবে জারুল শাখায় যে-অফুরন্ত,
আমারো জীবন জারুলের মতো করবে তুচ্ছ
সকল চিহ্নঅবলেপকারী কালের ইচ্ছা,
আমিও পারবো এ-মরদেহের ধ্বংস ভুলতে,
হিমে উলঙ্গ কালের শাখায় পুচ্ছ তুলতে।

আমি তো কখনো করি নাই তাই কারো প্রতীক্ষা।
হায় দুরন্ত শ্রাবণ! তুমিই দিয়েছো শিক্ষা
হৃদয় শুধুই দুহাতে বিলোতে, ঝরাতে শুধুই।
তোমার মতোই সঞ্চয় আমি রাখিনি কিছুই।

আজ রাত্রিতে বৃষ্টি নেমেছে। একা বিছানায়
ঘুম চোখে নেই। শুয়ে শুনি হাওয়া ডেকে-ডেকে যায়।
যেন মনে হয় এই রাত্রিতে এখানে আসার
কতকাল থেকে রক্তে আমার কথা ছিলো কার।
আমাকে অমর করার মন্ত্র সে বুঝি জানতো।
সে অপার্থিব, সে অফুরন্ত।
সে যেন আমার লক্ষ্যবিহীন সকল গানের
অকূল মোহানা। সে যেন আমার অধীর প্রাণের
চির প্রতীক্ষা।

হায় দুরন্ত উতল শ্রাবণ, তোমার শিক্ষা
এই তো করলো!
এবার কি তবে জলে লিখে নাম
চ'লে যেতে হবে? কী তবে পেলাম! কী তবে হ'লাম।

মৌমাছি প্রসঙ্গ

কলিকাকে কেউ ভাবো যদি ফুল,
তোমাদেরই ভুল তোমাদেরই ভুল।
পাখির ডিমকে পাখি?
আমি লজ্জায় মুখ নিচু ক'রে থাকি।
ভুলো না ভুলো না এখনো সে শুধু কলি
যত বিরক্ত মৌমাছিদের বলি।

একদিন হবে টুকটুকে ফুল লাল,
ভ'রে দেবে মধুগন্ধে এক সকাল,
হাওয়া দোলা দেবে তারে।
সেদিন সে জেনো হাসির ঝলকে
একটি মাত্র চোখের পলকে
স্বর্গ মর্ত্য এবং পাতাল জয় ক'রে নিতে পারে।
আজ সে কলিকা, কুণ্ঠিত পল্লবে।
তারও একদিন ভোর হবে ভোর হবে।
হাত তুলে বিস্ময়ে
বলবে সবাই : সেই কলি এই ফুল !
এই সেই মেয়ে ছিলো যার এলোচুল,
লুকিয়ে বেড়াতো সংকোচে লাজে ভয়ে ?

দুরন্ত দুপুর

এই দুষ্টু হাওয়া নিয়ে কত আর পারি ?
সামান্য গল্পের বই—তাও যেন রহস্যের শাড়ি,
পিঠ ঢাকা এলোচুল, ভয় ঢাকা কার বুক ঘিরে
শান্ত হ'য়ে শুয়ে আছে ! কপট ছলনা নিয়ে ফিরে,
বার-বার তাই তার আসা চাই। থেকে তাকে-তাকে,
পাতা এলোমেলো ক'রে হঠাৎ পালাবে এক ফাঁকে—
কিছুই হয়নি যেন !—তার যেন মন প'ড়ে আছে
সাতবাসি খবরের কাগজের নর্তকীর নাচে
মলিন গলির রোদে।
ঘুরে-ঘুরে পাড়ায়-পাড়ায়
আবার কখন এসে কপাটের আড়ালে দাঁড়ায়,
চপল আঙুলে নাড়ে ঘামে-ভেজা কপালের চুল।
অবুঝ মনকে বলি : এখনো বোঝোনি তুমি ভুল ?

সিঁড়িতে নরম চটি, বারান্দায় কার ঠাণ্ডা-স্বর
কেন মিথ্যে শোনো আজো ! কেন করো এ-ঘর ও-ঘর
ছাদের সিঁড়িতে কেন থামো ? নেমে ঢকঢক খাও
কোণের কুঁজোর জল ? অতীতের অভ্যাসে দাঁড়াও
বিবর্ণ আয়নার পাশে ?
কী তন্ময় স্নিগ্ধ চোখে চায়
শূন্য ঘরে শঙ্খশাদা এ-কঠিন দেয়ালের গায়ে
যামিনী রায়ের ছবি। এ-জীবনে যা আছে জানার,
যত শোক, যত সুখ, কান্নার করাতে যত ধার,
যে-যে ঘাসে যে-যে রঙ, হৃদয়ের যতটা উষ্ণতা
জানা চাই সব জেনে পরম নির্বাক শেষ কথা
উচ্চারণ করে তার তৃপ্ত চোখ : শান্ত হও মন।

তবু ভাবি জীবনের এ-ইস্কুল বাজাবে কখন
শেষ ঘণ্টা। কবে আমি শেষলেখা লিখে দিয়ে স্লেটে
সন্ধ্যাতারা গুনে-গুনে, নদীর পাড়ির পথ হেঁটে
বাড়ি যাবো। হাই ওঠে। ঘুমে চোখ ভরে।

দুপুরে দুরন্ত হাওয়া : মনে পড়ে, কাকে মনে পড়ে।

যুগল মেয়ে

দুটি মেয়ে থাকে এক বাড়িতেই,
এক ঘরে শোয়, পড়ে।
প্রথমা যে-হাসি সুরু করে চোখে
দ্বিতীয়টি শেষ করে।

এক প্রদীপেই কাজল বানায়,
দুজনেরই চোখে আঁকে,

দুজনেরই ভয় সন্ধ্যা নামলে
প্রান্ত গলির বাঁকে।

একই শাখা থেকে ফুল তুলে আনে,
গাঁথে একখানি মালা।
ভাবি : কখনো কি জ্বলে দুই বুকে
একই বাসনার জ্বালা!

দুই নদী

সারাদিন থাকি এক নদীর পাশেই,
ছোটো এক নদী।
রূপালি প্রলাপ তার স্রোতে উদ্বেল,
আঁকাবাঁকা গতি।

সারাদিন থাকি এক মেয়ের পাশেই,
নদী তার দেহ, তার মন।
নিশিদিন ডাকে তার কণ্ঠ-কুহক
কথা-কওয়া-নদীর মতন।

সারাদিন গান শুনি, কথা শুনি তার,
ভাষা বুঝি নাই।
সারাটি বসন্ত ভ'রে দেখেছি দীঘল
মায়াবিনী চোখের দোহাই॥

প্রার্থনা

গান দাও, গান দাও।
হে আকাশ, হে ধরণী, হে বেদনাতুর
শীতের বনের বায়ু,
হে অনন্ত একতারা স্বর,
হে রাত্রিশেষের তারা,
ক্ষীণ আয়ু, হে অশ্রুবরণী,
বসন্তব্যাকুল শাখা সর্বপত্রহারা,—
দাও, গান দাও।

রাত্রি আনে কত রূপ, পরিচ্ছন্ন প্রশান্ত আকাশ।
তবু কেন মধ্যদিনে জ্ব'লে যায় যত কচি ঘাস
হৃদয়ে আমার!
কে সে নারী, কান্তা করুণার,
হিমে-ঝরা উপবনে আনবে প্রথম
ফাল্গুনের হাওয়ার গরম?
স্পর্শে কার ভেঙে যাবে ভয়,
হবে সুসময়,
দেহের মাটির ভাঁড়ে ঢালা হবে পুরা
স্বাবলম্বী শোণিতের সুরা?

না হয় ডুবাও জলে, হাওয়ায় শুকাও,
তবু গান দাও।
হানো ঝঞ্ঝা, হানো বাজ, আনো দাবদাহ,
ঝরঝর মৌসুম প্রবাহ
সারারাত্রি না হয় ভাসাক:
আমার মনের যত কল্প-কল্প অন্ধকার রাত
অবশেষে ছিন্ন হ'য়ে যাক।

ভাঙো, ভাঙো, চূর্ণ করো, নিঃশেষে কাঁদাও
তারপর বুকে তুলে নাও।
দাও, গান দাও।

শান্তিনিকেতনে ছুটি

দূরে এসে ভয়ে থাকি : সে হয়তো এসে ব'সে আছে।
হয়তো পায়নি ডেকে, একা ঘরে জানালার কাচে
বৃষ্টির বর্ণনা শুনে ভুলে গেছে এটা কোন সাল।
ভুলে গেছে জীবনের দরিদ্র ধীবর আর জাল
জোড়া দিতে পারবে না। যদি দেয়, তবু ক্ষীণ হাতে
সেই ধূর্ত মাছটাকে পারবে না ডাঙায় ওঠাতে।
পারলেও অভিজ্ঞান সে-অঙ্গুরী হয়তো বা ফিরে
পাবে না পাবে না তার শীতল পিচ্ছিল পেট চিরে।

যদি পায়?
যদি তার এতকাল পরে মনে হয়
—দেরি হোক, যায়নি সময়?

শান্তিনিকেতনে বৃষ্টি : ছুটি শেষ। ভিজে আলতা লাল
শূন্য পথ। ডাকঘরে বিমুখ কাউণ্টার চুপ। কাল
হয়তো রোদ্দুর হবে, শুকোবে খোয়াই, ভিজে ঘাস।
লোহার গরাদে ঘেরা আম্রকুঞ্জে কবিতার ক্লাশ
কাল থেকে ফের।
ঘুমে ফোলা চোখ, ভাঙাভাঙা গলা,
কবে সে মন্থর পায়ে পাতাঝরা ছাতিম তলায়
একা এসে ঘুরে গেছে?
ঘণ্টা শুনে হঠাৎ কখন

অকারণে দিন গেলো। ছায়াচ্ছন্ন শান্তিনিকেতন।

কলকাতায় ফিরে যদি—যদি আজ বিকেলের ডাকে
তার কোনো চিঠি পাই ? যদি সে নিজেই এসে থাকে ?

ভীরু মেয়ে

তোমার সোনালি চুলের গুচ্ছে লুকিয়েছিলেম
মৃদুকরুণার সুরভি স্বপন,
কৈশোর প্রেম।
সাহারার পথে যেন রেলগাড়ি,
সারি-সারি চলে যাত্রীসময় :
মনে ভেবে দেখো তোমার সে নয়,
আমারো সে নয়।
রোদ শুষে নিলো প্রভাতী-শিশির,
তন্দ্রার ঘ্রাণ গভীর নিশির :
তুমি জাগলে না, শুধালে না পরিচয় !
বড ভীরু তুমি, বড় ভীরু ও-হৃদয়।
পদতলময় ঘাসের সবুজ,
হাবালে, অবুঝ, সোনালি সময়।
তবু ভীরু মনে কী আঁধার ভয় !
তবু আঁখিতারা ভয়তন্ময় !
স্তব্ধ নিষেধ তনুমনময়
উত্তাল তব তনুমনময়।

বানানো ভালো

বাদলের সুরে চমকে তাকাই, চেনা মনে হয় !
চোখে-স'য়ে-যাওয়া বিবর্ণ রাত এ নয়, এ নয় ।
কুন্তলকালো, জল ঝরঝর, মনে পড়ে নাকি
সেই রাতখানি ? কতকাল পরে ফিরেছে হারানো ঝড়ে-পড়া পাখি ।
কোন গাছে তার বাসা ছিলো, কোন নদীর তীরে ?
জারুল ? কদম ? বুক পেতে শুতে এসেছে ফিরে ।
কোথায় সে-গাছ ! সে-নদী কোথায় ! আযোজন কাঁপে চড়ার বালি,
উত্তরে পুবে বাজে ঝঞ্ঝার খর করতালি ।
কত বর্ষার ধারে কেটে গেছে পুরনো সে-তীর ।
ধীরে ব'য়ে যায় দূরে গতপ্রাণ সে-ভরানদীর ।
ছেঁড়া কাগজের টুকরো এবং শুকনো পাতায়
স্রোতোহীন জল ডোবে বিষণ্ণ পঙ্কিলতায় ।
ঘাসের কাশের নীল আকাশের ধার ছুঁয়ে নয়,
পাথরে বাঁধানো তীরতলে বয় ভিন্ন সময় ।

সরাইখানার খোলা জানালার পাণ্ডু আলোয়
পেয়েছি আবার মন ভোলাবার বানানো-ভালোয় ।

মাঘ শেষ হ'য়ে আসে

মাঘ শেষ হ'য়ে আসে,
ভোর হ'লো হিমে-নীল রাত।
আলোর আকাশগঙ্গা ঢালে কত উল্কার প্রপাত
আনত ওষ্ঠের তাপ বসন্তের প্রথম হাওয়ায়।
তবু ক্লান্তি চোখের চাওয়ায়।
দিন ভ'রে ওঠে স্বাদে, ভরে রাত,
তুমি কাছে নাই।
বসন্তের জানালায় মাঘের রাতের শীত
একলা পোহাই।

আয়না

আবার আষাঢ়। অরুণা, তোমার জন্মদিনের মাসে
তোমার কথাই ঘুরে-ঘুরে মনে আসে।
এখনো আশার অলীক লাটাই
থেকে সুতো ছেড়ে শূন্যে পাঠাই
সাততালিমারা, তবু নির্ভীক, ঘুড়ি।
হাসিকান্নার রোদে বন্যায় আকাশে উড়ি।
অর্বাচীন আর অবোধরা ছাড়া কখনো যাকে
কেউ দেখলো না—অরুণা, জানো ?—
সে-চাঁদের বুড়ি এখনো আমাকে ডাকে !
কথার জোনাকি খুঁজে কাটে কাল হেলায়।
চকচকে চোখে রাত কেটে যায় অগণ্য নীল সুখী তারাদের মেলায়।
চতুর হইনি, ভাগ্যে ছিলো না। তবু যে কী ক'রে কুড়ি
অনায়াসে আমি কাটিয়ে দিলাম ! তুমি ভাবো—'আজো কাব্যি !
হায়রে আজো কি রাবিশ চাঁদের বুড়ি !'

ঠাণ্ডা চা হাতে করুণায় বুঝি ভাবছো—'ওহো,
কিছুতেই ওর কাটলো না আর মিথ্যে মোহ !
লোকে ব'য়ে যায় জুয়োয় মদে কি রেসের ঘোড়ায় ;
সাতপুরুষের ছাতাপড়া টাকা দুহাতে ওড়ায় ।
কিংবা লুটোয় রূপসী মেয়ের পায়ে ।
তাও যদি হ'তো, তা-ও যদি হ'তো, হায়রে !'

যদি সম্বিৎ ফেরে, করেছো তো চেষ্টা,
দাওনি আমল, তবু যদি বুঝি ! শেষটা
কিছুতে রক্ষা হ'লো না । ভাবছো, 'ইচ্ছে হ'লেই পারতো !
নিজের হাতেই কবরে শোয়ায় কেউ কি নিজের স্বার্থ !
বীরের মতন সোনার ষাঁড়ের লেজ ধ'রে কেন ঝুলে
পড়লো না হায় এ-বেচারা !'—ভেবে হাত দিলে বুঝি চুলে ।

পৃথিবী তোমারই এই উদ্দাম বিশ্বের প্রান্তে ।
সাত সাগরের আষাঢ় এসেছে তোমাকে জানতে ।
তুমিও কি জানো, অরুণা, তুমি কি জানো ?—
—ঘুমের পাপড়ি খুলে
কার স্বপ্নের কুসুম গন্ধ ঢালে
তোমার শরীরে, তোমার মাথার চুলে ?
অবহেলাভরে যে-কথা ছুঁড়েছো, কখন ভরেছে সুরে !
আজ উঠে আসে প্রাণের সিঁড়ির গোল ধাপ ঘুরে-ঘুরে !

পাখা নেড়ে দিন উড়ে চ'লে যাবে, ঝরবে বৃষ্টি ।
কোন অলক্ষ্যে ঘুম-ঘুম হবে চোখের দৃষ্টি ।
আয়নাকে যদি সুধাও সেদিন—'আয়না, বল,
করিসনে আর মন ভোলাবার মিথ্যে ছল,
বল কী হয়েছে ? নিজের কানেও কেন লাগে বেমানান
নিজেরই গলায়, একদা সমাজে তুফান-তোলানো
হৃদয়-দোলানো সব গান ?

এখনো অনেক যুবক গড়ায় পায়ের কাছে,
আঙুল তুললে সেও মনে করে ভাগ্য,
হাসি ছুঁড়ে দিলে কৃতার্থ হয়,
ইশারা করলে পুতুলের মতো নাচে।
তবু অদৃশ্য মেঘ উঠে আসে, ছলনা রাখ,
কেন বল্ মনে থেকে-থেকে ডাকে ভয়ের বাঘ ?
এ কী জ্বালা, হায়, কী হ'লো আমার, বলতো আয়না ?
কেন ত্রিভুবন তুচ্ছ করার সাহস পাই না ?' —

আয়না কিছুই কয় না, উদাস চোখে চেয়ে রয় !
প্রতিচ্ছায়াব একগাছা শাদা চুলে বিলি দেয় চতুর সময়॥

ময়ূরভঞ্জ

বনের রাজ্য ময়ূরভঞ্জে কনকচাঁপার কানে
সেই বসন্তে ফুলের ঝুমকো কেন অত দুলেছিলো
ভুলেছো কি তার মানে ?
বুনো বাংলো-য় রাতে ঘুম নেই, উতলা মন।
তবু পল্লবে মঞ্জরী গুঁজে সেই শালবন
কত হাসাহাসি করলো সে-বার সুযোগ বুঝে ! হে উদাসীন,
ঘন বনপথ পাব হ'য়ে এসে
ভুলেছো সে-বার দুঃখের শেষে
উষ্ণ চৈত্র কখন জাগালো সুখের দিন ?
শত কবিতার ঘুমভাঙা ভোরে এনেছিলো কচি আম
সে-কোন গ্রামের সাঁওতাল মেয়ে, ভুলেছো কি তারো নাম ?
বিকেলে ঝরলো একটি বাতাস পাকা মহুয়ার মতো
চুম্বনে-নত-চৈত্রগোধূলিরক্তিম বনতলে,
হে পর্যটক, গেছো কি ভুলে ?

রুমির ইচ্ছা

আমি যদি হই ফুল, হই ঝুঁটি-বুলবুল হাঁস
মৌমাছি হই একরাশ,
তবে আমি উড়ে যাই, বাড়ি ছেড়ে দূরে যাই,
ছেড়ে যাই ধারাপাত, দুপুরের ভূগোলের ক্লাশ।

তবে আমি টুপটুপ নীল হ্রদে দিই ডুব রোজ,
পায় না আমার কেউ খোঁজ।
তবে আমি উড়ে-উড়ে ফুলেদের পাড়া ঘুরে
মধু এনে দিই এক ভোজ।

হোক আমার এলোচুল, তবু আমি হই ফুল লাল,
ভ'রে দিই ডালিমের ডাল।
ঘড়িতে দুপুর বাজে, বাবা ডুবে যান কাজে,
তবু আর ফুরোয় না আমার সকাল।

লাখো বছরের পুরনো জমিতে

লাখো বছরের পুরনো জমিতে
পুরনো মেঘের জলে
লাখো যুগ পরে একটি গুচ্ছ
সোনালি আঙুর ফলে।
রসে টুসটুস পাতলা শরীরে
অতটুকু ক্ষীণ প্রাণে
কত বসন্ত-সূর্যের তাপ
বহন ক'রে সে আনে!
এত আয়োজনে এতটুকু ফল—তুমি!
আট বছরের জন্মদিনের রুমি!

লগ্ন

আজকে আমার মন ছুটে যায় তোমায় নিয়ে ঢেউয়ের হ্রদে,
নীল আকাশের তলায় কালোপাহাড় পথে,
এখান থেকে অনেক দূরে।
হেমন্তের এই ঢালু বেলায় নরম রোদে ঘুরে-ঘুরে
ইচ্ছে করে একটি কথা ফিরে-ফিরে তোমায় বলার :
মন কি শুধুই ঢেউয়ের পাখি,
হে চঞ্চলা
হে মন ছলা
শকুন্তলা ?

আজকে কেন এ-রুক্ষ পথ ছায়ায়-ছায়ায় গেলো ঢেকে !
কার ইসারায় ? তাই দুরাশার
দুয়ার খুলে তোমায় ডাকি।
(এই তো বিয়ে !)
লক্ষ লোকের আনাগোনার
সড়কে, এই অভাবিতের
ক্ষণিক ছায়ায়, এ-নিভৃতের
সুযোগ নিয়ে
আমাদের এই চেনাজানা :
আমার মনের চাঁদের কোণায়
কালের মেঘের ধার ছুঁয়ে এই হালকা হাসি :
মুখ ফুটে তাও বলতে বাধে—'ভালোবাসি।'
ছোটো কথা !
আমার শপথ আরো বড়ো।
বরণ করো, শকুন্তলা, বরণ করো।
ঝড়ের রাতে ইচ্ছে করে এক চালাতে মাথা বাঁচাই।
সে-দুর্যোগে মূর্ছা যাবে কত মন্ত্রী, কত রাজাই।

ঝড়ের পরে প্রথম উষা, শুনবো কোথাও একটু ডাকে
স্থরের পাখি ভগ্ন শাখে।
আবার রোদে, আবার জলে প্রতিদিনের অশেষ চলা।
এইটুকু রাত! অনেক ব'লেও
কিছুই তবু হয় না বলা,
হে চঞ্চলা।

ট্রেন

স্বর্গের করিনি আশা।
অলকার অলীক বৈভব
স্বর্ণপারিজাত আর বাসবের অমৃত আসবে
কোনোকালে ভাবিনি যে একতিল অধিকার হবে।
ত্রিলোকরঞ্জিনী নটী উর্বশী রম্ভার
নির্বিকার মুখচ্ছবি কখনো ভাবিনি।
অসম্ভবে দাবী নেই। এখন গম্ভীর
জীবনের দীর্ঘ ট্রেন উর্ধ্বশ্বাস। ঘুবন্ত চাকায়
শব্দের পাঁজর ভাঙে. চূর্ণ হয় সময়েব বুক :
এর চেয়ে দুঃখ দ্রুত? রোমাঞ্চিত এব চেয়ে স্থখ?
কখন পেরিয়ে গেছি শেষরাতে-আলো-জ্বলা, ঘুমে অচেতন,
দুরাশার সিঁড়িতোলা অজানা স্টেশন।
কখন ছেড়েছে গাড়ি, থেমেছে কোথায়,
ঝুড়ি কি জলের কুঁজো হাতে ক'রে কে উঠলো.
কারা নেমে যায়.
করবীর ডালে ব'সে ডেকে যায় যে-পাখিটা
কী যে ওর নাম—
আনমনে ছাড়িয়ে এলাম।

প্রকাণ্ড সূর্যের নীচে শ্রমে তিক্ত, জ্বরে মূর্ছাতুর
আকাশ-পৃথিবী-ভরা প'ড়ে আছে নির্বাক দুপুর।
আদিগন্ত রেলপথ—অনিশ্চিত অনন্ত সময়—
জীবনের লৌহচক্র অক্লান্ত ইচ্ছায় পার হয়।
মুহূর্তের বনপথ, মুহূর্তের মাঠ,
জ্যোৎস্নায় কুঞ্চিতরেখা হ্রদের ললাট,
গোধূলিতে হাটফেরা মানুষের ভিড়
পার হ'য়ে মধ্যরাতে উদ্দাম নদীর
নির্জন পাড়ির 'পরে চিরতরে থেমে যাবে ট্রেন :
প্রশ্ন শুধোবে না কেউ—'কোথায় যাবেন ?'
আকাশ দেবে না আলো, স্বর্গ পাঠাবে না
অমরার করুণার সেনা।

দ্রুতদৃষ্টি দেখে নেয় অবসন্ন মহানগরীর
সীমান্তে পোহায় রোদ আকাশের আশ্চর্য শরীর
আলোব সমুদ্রে সেরে স্নান।
অতলান্ত নীল তার চোখে ভরা প্রাণ।

আমার সামান্য রুটি, সামান্যই জল
ট্রেনের সম্বল।
কর্কশ-কম্বলে-ঘেরা অপ্রসর শয্যাভরা রাত
নিয়ে জেগে ব'সে আছি ; কবে অকস্মাৎ
ছবির মতন ছোটো কোনো এক ইস্টিশানে
ওঠে যদি সে-ও
যাকে ভেবে এতকাল হৃদয়ে তুলেছি কত ঢেউ,
যে এসেছে অতিদূর আপনার ঘর থেকে তার
মাঠের শিশির ভেঙে, ফেলে তার মায়ের সংসার,
ফেলে তার সখীসোনা, ফেলে তার দীঘিভরা জল.
ট্রেনের বাঁশির সুরে উতলা চঞ্চল।
সুন্দর কপালে আঁকা বিন্দু-বিন্দু ঘাম,

ভোরের ঘুমের মতো স্নিগ্ধ যার নাম,
যে আছে অপেক্ষা ক'রে সহস্র নিদাঘে ভরা যেন এক
        ছায়া সুশীতল :
তারে নিয়ে তবে আমি ভাগ ক'রে খাই
তৃষ্ণার পবিত্র তীর্থে সামান্য পাথেয় এই জল।
কর্কশ কম্বলখানি—মমতা চিত্তের—ছেড়ে দিই তারে,
জীবনের অপরূপ সীমান্ত-ট্রেনের উন্মোচিত জানালার ধারে।

তখন পাহাড়তলে বিকেলের ছায়া নামে না হয় নামুক,
        অরণ্য নীরব :
সূর্যের উজ্জ্বল চোখ ম্লান মেঘে হয় হোক ফিকে,
        অন্ধকার নেয় নিক সব।
চোখে তার চোখ রেখে জীবনের জানালায়
        আমি শুধু বসি দণ্ড কয়।
না হয় সে নেমে যাবে পরের স্টেশনে,
        যাবেই না হয়।

আঁকাবাঁকা বালি

কাহিনীর কালো চুলে শৈশবের আচ্ছন্ন হৃদয়
পার হ'লো আঙিনার জ্যোছ্‌না-আঁকা স্বপ্নের সময়।
তারপরে কত নদী হ'য়ে গেলো আঁকাবাঁকা বালি।
নত চোখে কে দাঁড়ায় দোতলার জানালায়
সন্ধ্যায় বৃষ্টির পরে নীল আলো জ্বালি।
সে-জানালা বন্ধ হয়, ট্রেন যায় দূরে মাঠ দিয়ে।
উড়ো-উড়ো শোনা যায় তপতী সেনের নাকি বিয়ে!

ঝিলের ঝালর কাঁপে ঝাউয়ের ছায়ায়
ম্লান জ্যোৎস্না সন্ধ্যার হাওয়ায়।

তখনো ছলনা লাগে—লঘু পায়ে ঘাসে
কে আসে, কে আসে !
ভ্রম ভাঙে, কেউ নয়। আসে যায় অবিচিত্র রাত !
(জীবনের রূপ গড়া আমার কি হাত ?)

নগরে শিবিরে গ্রামে ধু-ধু জ্ব'লে যায়
সিগারেট, নারীর শরীর।
রাত্রি শেষে বৃষ্টি নামে ছাদে পথে গলির কোনায়
মহানগরীর।

আলোক পায় না সাড়া

আলোক পায় না সাড়া চোখের তারায়
এখনি যে, কত কিছু হারালেম।
চোখ মেলে দৃশ্যের মিছিলে মেলায়
ভিক্ষুর দীন হাত বাড়ালেম।

অনেক গানের শুধু প্রথম চরণ
শুনেছি তো অচেনা গলায়,
কত নৃত্যের ভীরু প্রথম আবেগ
উদ্ধত মেয়ের চলায়।

যাকে ভালো লেগেছিলো, যে কখনো তবু
আনে নাই চোখে তার প্রেম,
তার কালো পক্ষ্মের অকারণ কাঁপা,
দুর্লভ ছবি, হারালেম ?

দুপুরের আকাশের যে-মেঘের কণা
মুছে যায়, জ'মে ওঠে ফের,

তার লঘু চপলতা, অলস খেয়াল,
ভাসবে না সমুখে চোখের ?

জীবনের ক্লান্তির জল ঠেলে-ঠেলে
উঠি যদি কারো ঘরে শেষে,
দেখবো না হাসে কিনা সে-চোখের তারা ?
ঝলে কিনা অকারণ শ্লেষে ?

মেলা শেষ হ'য়ে যাবে, ঘরে যাবে লোক।
ওপারে বনের কালো রেখা।
আঁধার নদীর চরে মেলা অবসান,
সে-মিছিল হবে নাকো দেখা।

তুমি কি রেখেছো কথা

আকাশ ঘনিয়ে এলো হেমন্তের বিকেলের সুরে,
কত বর্ণে কারুকাজ অস্তরাগ-রংরেজিনীর।
কাহার খোঁপার গন্ধ খুলে দিলো সায়াহ্ন-তিমির ;
নিঃসঙ্গ পাখির মতো ক্লান্তি নিয়ে এলো ঘুরে-ঘুরে
আর এক দিনের কথা : চোখ মেলে আকাশের নীলে
—'তোমার রক্তের মতো পবিত্র হবো'—বলেছিলে।
তারপর কতকাল উড়ে গেছে, জলহারা মেঘ।—
তুমি কি রেখেছো কথা ?
দেখেছো পবিত্র কিনা এ-নিঃসঙ্গ রক্তের আবেগ ?

শকুন্তলা

কত আঁকাবাঁকা নদী হ'লো মেঘ, ছায়া হ'লো দিন.
          শকুন্তলা,
আর কবে আমি শুধবো তোমার ঋণ ?
কতবার দেখো পূর্ণ হয়েছে চাঁদের কলা,
          শকুন্তলা,
আরো কতবার আকাশ শুনেছে শরতে সানাই।
বেশ তো, না হয় তুমি কাছে নেই,
বেশ তো, না হয় আসবে না তুমি আর, তবু কাল
আকাশ হাসবে, আকাশে হাসবে সোনার সকাল।
পাখি হবে গান, গান হবে সুর, আলো হবে ফুল :
বেদনার মতো ঝ'রে যায় যাবে ডালের মুকুল।
আবার আষাঢ়ে ঝর-ঝর ধারে মেঘ হবে জল।

স্বপ্নে তবু কি চিরদিন এক কালো কুন্তল
এলোমেলো হ'য়ে ছড়িয়ে থাকবে ?
                              আর বারবার
স্বর্গ-শিশির সপ্তর্ষির অস্তে যাবার
আয়োজন হ'লে ভেঙে যাবে ঘুম, ভ'রে দেবে ঘর
অশরীরী সেই চির-চেনা স্বর ?

আজো কে আমার বন্ধ দুয়ার ঠেলে ফিরে যায় !
কার নিঃশ্বাস গালে এসে লাগে রাতের হাওয়ায় !
ও কিছুই নয়, ও কিছুই নয়। সময়ের ঢেউ
ফেরাতে কখনো পারবে না কেউ।

ভোরে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে আসি, কাজে চ'লে যাই,
ধুলোয় কাদায় ধোঁয়ায় বাষ্পে নিজেকে হারাই।
অপমানে পাপে আত্মাকে আমি যত করি ক্ষয়

তবু থাকো তুমি ! তবু তো সময়
কী যাদুমন্ত্রে বোঝা ভারি করে যত যায় দিন,
শকুন্তলা,
আর কবে আমি শুধবো তোমার ঋণ ?

অজাতশত্রু গান

কত না ভেবেছি আমার এই যে সাধনার বীণা কাব্যে
এমন রাগিণী বাজাবো যে সারা বিশ্বের লোক ভাববে,
হাটে বাটে যেতে কাজ ভুল ক'রে—'মন,
কাজ থাক, আজ চুপ ক'রে ব'সে শোন।'
কেউ হাসি, কালো চোখের দু'ফোঁটা জল দেবে কেউ,
তাই নিয়ে আমি পার হ'য়ে যাবো সময়ের ঢেউ।
কত না ভেবেছি শিশুর চোখের লালপরি নীলপরি
আমার গানের ফাঁদ পেতে যেন ধরি।
আমার গানের ঘাসে
দুখানি তপ্ত কোমল চরণ ফিরে-ফিরে যেন আসে।
হেমন্তে শীতে রাত্রিশেষের আকাশের যত তারা
সে-রাগরাগিণী আলাপ করবে নিঃঝুম ঘুমহারা।
মেঘ নেমে এসে ধুয়ে নিয়ে যাবে অজয় নদীর বালি :
দুই তীর থেকে বধির শ্রাবণ দুই হাতে দেবে তালি।
সাতপুরুষের ভিটে মাটি ফেলে পার হ'য়ে যাবে চাষী
সন্ধ্যার খেয়া : মুছবে চোখের কাজল, ঠোঁটের হাসি।
তবু আর বার নতুন কালের নবজাতকেরা এসে
সব জেনে শুনে পড়শীকে ডেকে কানে-কানে ক'বে : কে সে ?
—কখনো চিনি না যাকে—
আমার প্রিয়ার কালো দুই চোখে কাজল এঁকেছে দুই শতাব্দী আগে !

কত না ভেবেছি মৃত্যুর পরে হয়তো হবো না তারা,
কিন্তু আরেক আকুল কামনা করেছে আত্মহারা
প্রাণকে আমার। করেছি শপথ—দুঃসহ হোক যত
প্রাণধারণের কঠিন চাবুক, গ্রহতারকার মতো
মানুষের মনে হাসি-কান্নায় তবু যেন আমি থাকি।

আজ চেয়ে দেখি দেহে যৌবন বেশি নেই আর বাকি।

এখনো তো বুকে রক্তের ঢেউ উঠে
মূঢ় তরঙ্গে আকাশে-আকাশে ভেঙে পড়লো না লুটে?
গানে-গানে আজো জাগলো না, জ্বললো না
কালো-মেঘ-ছোঁয়া শুক্লা চাঁদের কোণা?
অনায়াসে কবে মুখ ঢেকে কালো চুলে
হে স্বয়ম্বরা, তুমিও গিয়েছো ভুলে।

দিশাহারা পথে পৃথিবী এসেছে আশা নিয়ে ফিরে-ফিরে
আমি কি চলেছি বিস্মরণের কৃষ্ণসাগর তীরে?
জলে নাম লিখে চ'লে যেতে হবে? আজো
আমার গানের বীণাকে বলছি—বাজোরে যন্ত্র বাজো,
ভেঙে হও খানখান:
তবু দিয়ে যাও অজাতশত্রু গান।
আমি যে ভেবেছি মৃত্যুকে দিয়ে মৃত্যুকে হবো পার,
কবিতা আমার, কবিতা আমার।

মৃত্যুর পাখি

মৃত্যুর পাখি ছায়াতলচারী,   পলকে
পৃথিবীর বনে উড়ে-উড়ে বসে,
                    রাঙা জীবনের   ফলকে
অগোচরে ফেলে ছায়া।

কত হাঁস ওড়ে শাদা দীঘিটায়,
বাঁকা রোদ পড়ে আপন ভিটায়।
চ'লে যেতে হবে? মনে হয় যেন মায়া।
বর্ষার ঘাট জলে ছলছল,
অনুরাগে আঁকা চোখের কাজল,
ভরা বুক কাটে সাঁতার।
পিতলের হাঁড়ি, বিছানা, চাদর,
পোষা ভেড়া গরু কুড়োয় আদর।
ঘুম চোখে নেই: স্বপন বিছানো ঘরসংসার পাতার।

এরই মাঝখানে চলে আনাগোনা,
ছায়াতলে আরো ঘন ছায়া বোনা,
মুছে ফেলবার নিষ্ঠুর এক জটলা।
যা হবার হয়; যাবার সময়
হাটে যায় লোক, হেসে কথা কয়।
থাকে যা থাকার। এ-মাটির মন অটলা।

আমার বন্ধুকে
(অম্লানের জন্য)

হে প্রাণ, যৌবনে জাগো, এখন তো গ্রীষ্ম বারোমাস।
এখন জীবনে গ্রীষ্ম। চপলা নর্তকী
ছয়ঋতু, ছয় সখী, যেই রঙ্গে যেমন নাচুক,
আমার শরীরে মনে মধ্যদিন বৈশাখের সুখ।
শ্রাবণে অঘ্রাণে মাঘে বর্ণহীন বিরক্ত চৈত্রেও
সূর্যের মমতা আর মৈত্রেয়ী মাটির
জরায়ুর অন্ধকারে উৎসারিত প্রাণের যে তাপ,

সঞ্চারে আমার রক্তে ধমনীতে শিরায়-শিরায়
কে মনোহারিণী !
আহা, কার এই দায় ?
অবজ্ঞায় ভুলে থাকলেও,
দুইমাস দাড়ি না-কামিয়ে
চুলে তেল না-মেখে হেলায়
ঝরা সময়ের পাতা হাওয়ায় ওড়াই যদি তবু :
দুপুরে ঘুমোই আর সারারাত বিছানায় জেগে
বই পড়ি, ছাইদানে অকারণে পোড়ে সিগারেট :
আকাট মূর্খও যদি হই, থাকি যথার্থ নিরেট :
কামুকের করুণায় ক্ষণিকার প্রার্থনা পুরিয়ে
আরেক সকালবেলা হাওয়ায় জুড়িয়ে ভুলে যাই—
অপরূপ শরীরের রোমাঞ্চিত শিখরে-শিখরে
অবিস্মরণীয় হ'য়ে জ্বলেছিলো যেই অন্ধ রাত :
ভাঙা চাঁদ, লক্ষ তারা সাক্ষী ক'রে প্রাণের আবেগ
অজস্র ঝরিয়ে যদি অন্তরায় অবসাদ আসে :
—তাহ'লেও গ্রীষ্ম জানি সহ্য ক'রে যাবে
সব কিছু নিরুপায় ভাবে।
যতই দাম্ভিক হই, (যদি হই),
যতই কুটিল হোক, (যদি হয়),
মিত্রতা আমার,
গ্রীষ্ম জানে প্রকৃতির এক্ স্বার্থ সিদ্ধ হ'লে সবই সয় তার !
কেননা আমি তো দেখি—এতখানি আমি, মানে আমার বয়স,
বিশ্বের সকলই মানে বশ।
বিশেব বারান্দা ঘুরে ত্রিশের সিঁড়ির মাঝামাঝি
এখনো তো কিছুকাল আছি ?
এখানে দাঁড়ায় যারা, কত দম্ভে ঠোঁট টিপে হাসে,
বৃদ্ধেরে বিদ্রূপ করে, অক্ষমেরে সহ্য করে ক্ষোভে,
লোভের কঠিন হাতে দশ আঙুলে জীবনের বাটি

চোখ বুজে মুখে তোলে, মুগ্ধ হ'য়ে শোনে
দেহের বন্দরে ভাঙে যৌবনের জোয়ারের ঢেউ।
দারুচিনি-লবঙ্গের পণ্যে-ভরা-জাহাজের রোদে-পোড়া নাবিকের ভিড়ে
দুপুর গুঞ্জিত হয়। দড়ি ছিঁড়ে হাওয়া দেয় লাফ।
বাড়ে বেলা। বাড়ে তাপ।
কত তারা, নিরুদ্বেগ মনে
প্রত্যাশী নীলাক্ষীদের বন্দরে রেলিঙে
বুকচাপা রুদ্ধকণ্ঠ প্রণয়ের চাটুবাক্য শোনে।
দয়া হ'লে অবিকল আবেগের স্বরে
উচ্চারণ করে কিছু অব্যর্থ প্রস্তাব।
তবে কেন ভয় করি? কার অভিশাপ
আমাকে নিরস্ত করে? যদি চাই, এ-সবই তো পারি!
আমার সময় আজ। পৃথিবী আমারই।
গ্রীষ্মের বেদীতে ব'সে নটী প্রকৃতির
উপচার গ্রহণের আমার যে উত্তরাধিকার
সে-কথা জেনেছি আমি। সেই সঙ্গে জানি,
আরতির শেষে
বিসর্জনের স্বর উন্মত্ত ঢাকিরা অনায়াসে
একদা বাজাবে।
তাই বলি প্রজ্বলিত হও মন, পূর্ণ ক'রে বাঁচি:
স্পর্শে স্বরে গন্ধে স্বাদে যত পাই, আ জ ই।

জানি না কী ভাগ্যে আছে। এখনো তো গ্রীষ্মের প্রাসাদে
ঈষৎ ইশারামাত্র অগণ্য বাঁদিরা হাসে কাঁদে,
আশায় উদ্বেল হয়, আশঙ্কায় কাঁপে থরোথরো:
পূর্ণ করো, হে জীবন, অমর্ত্যের প্রতিশ্রুতি করো পূর্ণ করো।
জীবনে বিষুবলগ্নে প্রাণে মগ্ন চেয়ে দেখো
কিছুকাল এই রাজ্যপাট,
এই দৈব-দুর্দিনের সর্বস্ব আমার:
রৌদ্রময় এই দিন, এই ঠাণ্ডা স্নানের পরশ,

দুদণ্ড গল্পের সুখে মগ্ন করা উদাস বিকেল,
ধুলোভাঙা রাঙা পথে গোরুর গাড়িতে চ'ড়ে খুশী,
কচি মুখে শাদা দাঁতে রোদের চিৎকার,
দুপুরে বন্ধুকে নিয়ে মেলায় আর দু'কাপ চা,
শেষরাত্রির হিমে যাত্রা শুনে বাড়ি ফিরে এসে
দূর গ্রামে শহরের চিঠির বিস্ময়,
(মনে হয় দূর আর যেন দূর নয় !)
খুশিমতো বই কিনে দেহঠাসা বাসের ভিড়েও
তারই হাতে পৌঁছে দেওয়া যার হাতে বই শোভা পায়,
পাতার কবরশায়ী অম্লেয় ইয়েটস্
কণ্ঠে যার গান হ'য়ে আবার বাঁচেন,
আর্ডেনের বন জাগে পাঁকে ভরা এ-কলকাতায় ।

এ-সুখ তো ক্ষণস্থায়ী ! এ-স্বরাজ মূর্খের প্রমাদ !—তাই যদি বলো,
তাহ'লে বলতেই হয়, এ-বিশ্বের সকলই তো তাই !
না হ'লে, শুধাই—
চিরকাল বলবো না—সামান্যই কয়েক হাজার
বছরের বালিঝড় পার হ'য়ে তবু বাঁচে, এত বড়ো পরমায়ু কার ?
যতদিনে ভাষা হয় অসেতুসম্ভব,
যতদিনে লেখা হয় হিজিবিজি অর্থহীন রেখা,
মন্দিরের ছাদ ধ্বসে,
নির্বোধ মাটির গ্রাসে সভ্যতা তলায়,
ক্বচিৎ চাষারা পায় চষাখেতে কোনো খসা ইট,
রোদে পিঠ দিয়ে ব'সে প্রাণ খুলে রাখাল বালক
মনিবকে বকে, আর ছাগলেরা দাঁতে ঘাসে কাটে,
শিশুরা প্রাচীন গাছে কোটরে পাখির ছানা পায়,
মোষ চরে মাঠে :
ততদিনে আশালুব্ধ, হে পথিক, কে আমি কে তুমি,
অবলুপ্ত কে জানে কোথায় ?
সময়ের সিংহাসনে দুদণ্ডের রাজত্বের শেষে

কবি শিল্পী সুরকার রাজা মন্ত্রী মজুর কৃষক
অবশেষে কীর্তিনাশা ধুলোতেই মেশে
একথাই মেনে নেওয়া যাক।
কী ব্যস্তবাগীশ কাল ! কিছুতেই তৃপ্তি নেই তার !
তত ভাঙে যত গড়ে, তবু তার মনে পড়ে
অসম্পূর্ণ এ-বিশ্বসংসার।

তাই বুক উঁচু ক'রে এলোমেলো খুশীতে পা ফেলে
বিকেলে গলিতে হাঁটা সহজ এতই !
কনকনে বৃষ্টিতে ভিজে মাথা না-মুছেই
গরম চায়ের বাটি হাতে নিয়ে দু'ঘণ্টা সরব
তর্কের হাউই হওয়া আমার সম্ভব।

কিন্তু এই শেষ নয়।
তারপর মাঘরাতে
শীতে ভীতু ভদ্র বায়ুসেবী
দোতলার ফ্ল্যাটে ফিরে পুরু লেপে ডুবে গেলে,
জানালায় মুছে গেলে আলো,
নির্জন মাঠের কালো ঘাসের জাজিমে শুয়ে
বলি—মন, এইবার জলো।
বলি - মন, এইবার গাও।
ত্রিলোকে অগণ্য শত্রু দিকে-দিকে থাবা পেতে আছে,
তা জেনেই নির্ভয়ে শোনাও,
যে-গান বানাতে পারো, যে-কাহিনী জানো,
প্রাণের গহন থেকে আনো আনো যত পারো আনো।

যে-আশা অপূর্ণ আছে, যে-পাখি সোনার খাঁচা ছেড়ে
একদিন উড়ে গেছে, অথবা যে-সোনারঙা পাখি
কোনোদিন আসবে না—তাদেরই কি গানে-গানে ডাকি ?
মধ্যদিন বৈশাখের এত দম্ভ সবই তবে ফাঁকি ?

চিন্তার লাঙল আজো কপাল চেরেনি ;
বিগতস্মৃতির ফেউ হৃদয়কে ছিঁড়ে খেতে এখনো ফেরেনি ।
গ্রীষ্মের প্রাসাদে, আহা, সর্বস্ব পেলাম,
রেখে যাই কিছু প্রতিদান :
আমার এ গান ।।

হাওয়ার হাঁস

তোমাকে আমি কী ননী দেবো, কী সর ?
দীঘির ধারে বনের আড়ে
শ্যামল শিশু যে-গাছ বাড়ে
তোমায় দেবো তার উন্মত্ত
লাল পলাশের কেশর ।
যে-হাওয়া নাড়ে পাতারে তার,
ঢেউয়েরে করে সাপের সাঁতার,
শিশির কাড়ে যে-হাওয়া তার ফুলে,
উড়াল পাখির ঝাঁকে মিশে
বিদেশ ওড়ে, গমের শীষে
শীত ঝরায় মেঘ-চাদর খুলে—
পুব পাহাড়ে কাঠের ঘরে,
সরাল হাঁসের বালির চরে,
হাওয়ার সে-চর পাঠাবো শত-শত :
আকাশ তলে যা-কিছু ধরে,
ঘাসের ঘরে তারার ঘরে,
আনবে খুঁজে তোমার মনোমতো ।

দিন জুড়োবে ঝিঁঝির গানে,
হাওয়ার হাঁস ঘরের টানে
খবর ঠোঁটে ফিরবে ঝাঁকে-ঝাঁকে,

যখন মায়ের কোলে ঘুমোয়
ক্লান্ত শিশু শান্ত চুমোয়,
নীল কুয়াশা বেড়ায় গাছের ফাঁকে।

দূরাশা

আজো জেগে আছি, ঘুমে দুই চোখ ক্লান্ত।
আসবে না আর আসবে না তুমি আগে তা কি মন জানতো?
মেনেই নিয়েছি ভোরের স্বপ্ন মিথ্যে,
অলীক আলোয় ছায়াপরীদের নৃত্যে
মূঢ় চিত্তকে করিনি আত্মহারা।
বুঝিয়েছি : মন, স্ববশে আনো তো লেখনী।
কাল-কে হারাবে কী দিয়ে? আজো কি শেখোনি
সার্থকেরা-ই পায় শুধু তার সাড়া?
কিছু-র বদলে কিছু দিতে হয়—এ-কথাটা কে না জানে?
সার্থকতা-ই হাত ধ'রে জেনো অভাবনীয়-কে আনে।

যদি তাই হয়, দিতে যদি হয় তুল্য,
ক্লান্তিবিহীন শ্রমে যা গড়েছি কিছু কি হবে না মূল্য?
মেঘে-মেঘে নীল কত আষাঢ়ের লুঠ-ক'রে-আনা পণ্য
গানের জাহাজে এনেছি তোমার জন্য।
করিনি লজ্জা, মনে বাসি নাই ভয়।
দস্যুর মতো মনের ঘোড়ায় চাপি
ছিনিয়ে এনেছি নীল তারাদের ঝাঁপি,
তুমি কি জানো না সে-জয় তোমারি জয়?

ভোরের স্বপ্ন মিথ্যে হয়েছে, দিনের ক্লান্তি মিথ্যে।
বিনিদ্র রাত, অধৈর্য-ভরা চিত্তে
—তুমি আসো নাই—ব'সে আছি একা বৃষ্টির সুরে ক্লান্ত।
মূল্যে তোমারে মেলে না একথা আগে যদি মন জানতো!

তাতার সমুদ্র ঘেরা

উৎসর্গ



চিন্নুকে

লোকটা

আকাশে সোনার মুখ দেখছে সারনাথে কে নতুন,
ধুলো-পা, আবিষ্ট চোখ, ব'সে থাকে মস্ত নীল মাঠে !
চারদিকে হিম শীত নক্ষত্রের উজ্জ্বলতাগুণ।
সে যেন পড়েছে লেখা 'অন্ধকার' ভাগ্যের ললাটে।

বিহারে গম্ভীর ঘণ্টা, ধ্বনি গাঁথে নেপাল-লাডাক-
সিংহল-তিব্বত-শ্যাম-কম্বোডিয়া-নম্র-মহাচীন,
এবং স্তূপের পায়ে একা লোকটা। হয়তো একই ডাক
তারও প্রাণ শুনেছিলো পদ্মাপারে বিজনে একদিন।

নাকি সারনাথে এসে শিলাকাটা বুদ্ধের অভয়
দেখেছিলো মিউজিয়ামে, অভ্যাসবশত লোভী হাত
ছুঁয়েছিলো শিল্প-ধ্যান, ছেনিতে বাটালে গড়া জয় ?
সে নিজে পারেনি, তার খেদ ক্ষুধা কান্নার আঘাত
রাত্রি জানে ? স্বপ্ন জানে ?

অথবা মন্দিরে যেতে ফিরে
ধমনীর সব রক্ত আছড়ে পড়েছিলো বুকে তার ?
মন্থর মেয়েটি তবু মিশে গেছে কুটিল তিমিরে ?
এখন পৃথিবীভরা অন্ধকার, শুধু অন্ধকার ?

সারঙ্গ উধাও, দীপ্ত মন্ত্রলাগা স্তব্ধ রাত, মাটিলেপা গ্রামে
স্ত্রীপুরুষ ঘরে গেছে: বেণুবনে--সুজাতা কি ?—চাঁদ একাকিনী
অপার আকাশী আলো মূলগন্ধবিহারের সিঁড়ি বেয়ে নামে।
সে পায়নি করুণা যাঁর, প্রভু তথাগত,
কেন এ-লোকটাকে ফেরালেন তিনি !

বিকল্পে উটের সার

বিকল্পে উটের সার, জীবনের গতায়ু বছর।
বালির দুর্গম তাপ, অস্থিসার উপত্যকা,
কঙ্কালকরোটিখসা ঝড়
পায়ে-পায়ে সঙ্গ নেয়। জলের উতলা গন্ধে,
খেজুরের কৃশ ছায়া খুঁজে,
ক্রমশ শুকিয়ে আসে সঞ্চয় যা ছিলো মেদ কুঁজে।

ধ্ব'সে পড়ে দিন রাত, আলো ফাটে, ছায়া দীর্ঘ হয়।
শান-দেওয়া অন্ধকারে ক্ষ'য়ে যায় নক্ষত্রবলয়।
তৃষ্ণার সমুদ্র থেকে সূর্য তোলে দানবের চোখ :
ভয়ার্ত ত্রিলোক
মানে না মনসার বনে শূন্যে তোলা অভয়মুদ্রাকে।
অদৃশ্য বায়সে খায় সময়ের যে-যে ফল পাকে।

অঙ্গার পথের ধুলো, আকাশ মূর্ছায়
ঢ'লে পড়ে ডাইনির গুহায়,
এবং ত্রিশূল হাতে দিক দেখায় কপট প্রেতেরা।
বিকল্পে উটের সার
কখনো ফিরবে না আর,
যেহেতু সম্ভব নয় ফেরা.—

যদিও অকল্পনীয় রাত্রিশেষে অন্য কোনো নগরের দ্বার,
বাগানে পাখির গান. ঈশ্বরের ঘুমন্ত সংসার।

দুটি কবিতা

(অশোক মিত্র-র জন্য)

১. ভেলা

পৃথিবী জ্ব'লে যায়, এখনো জলে ভেলা
ভাসেনি, তোলা আছে। কোথায় আছো তুমি ?
পাহাড়যুগলেরা আজ কি সমভূমি ?
শূন্য মন্দির শুধেছে অবহেলা ?

হয়তো অজগর গেলেনি হরিণীকে।
উপত্যকা থেকে কোথাও বারবার
এখনো প্রতিবাদী বাঘেরা হুঙ্কার
শোনায়, দাবানল যদিও দিকে-দিকে।

কখন সে-পাবক ঢুকেছে সব ঘরে,
চিনেছে নগরের জটিল পথঘাট,
হয়েছে শবাসীন, শ্মশানে সম্রাট !
কোথাও কিছু তার থাকেনি অগোচরে।

আমারও গেছে সব, নিয়েছে দাবানল।
যে-ভেলা ভাসলো না, এখন তাতে আর
কী হবে ফিরে পেয়ে অলীক অধিকার ?

কেবলই দূরে যায় নদীর কোলাহল।।

২. আলোয় অন্ধকারে

বিগত লগ্ন, মালিন্য জ্যোৎস্নায় ।
মনে হয় যেন একদা-সাধ্য সেতু—
মাতঙ্গ ঢেউ ধুয়ে নিয়ে চ'লে যায়,
ধ্রুবতারকায় জয় করে ধূমকেতু ।

গ্রীষ্মের শেষে খরতর গ্রীষ্মের
লাভা নেমে আসে উপত্যকার ঘাসে,
উড়ে যেতে-যেতে পথিক-পাখির ঝাঁক
অসহায় ডানা ঝাপটিয়ে নেমে আসে ।

সুপ্ত প্রাচীন পল্লী । স্বামীর শব
ছুঁয়ে ব'সে থাকে করুণ বালিকা যবে,
নগরে মাতাল মূষিকের উদ্ভব,
তৃপ্ত শকুনি ঝল্‌সানো পল্লবে ।

নিখিলে প্রলয় সমুপস্থিত যেন :
বৃথা প্রত্যাশা, থামে না দুর্বিপাক ।
অথচ এখনো ভুলতে পারি না কেন,
কেন মনে হয় শুনেছি ভোরের ডাক ?

আলো চোখে আজো ম্লান এশিয়ার কোণে
জরায়ুতে নারী শিশুর বার্তা শোনে !
শিশুকে কোথায় কে শোয়াবে, বলো, কার
অক্ষত হাত পরাবে সোনার হার ?
বুকে নিয়ে তাকে কে আজকে দোলা দেবে ?

আকাশে বিশাল বিদ্যুৎ চমকায়,
বৃষ্টি এখনো নামেনি মুষলধারে ।

ধুলোকালিকাদা দিল্লী কলকাতায়,
আমরা আহত বারুদে অন্ধকারে।

সে-নারী কোথায়, জন্মে-জীবনে জয়?
যার বাঁকা ভুরু, যার কালো চোখ, যার
চিকণ গলায় অলখ সোনার হার?
অমোঘ কণ্ঠে প্রভাতের নির্ভয়?

কাক

কলকাতা কৈলাস তার গ্রীষ্মের বিবস্ত্র দুপুরে।
বর্ষায় বিরক্তি নেই, কীটে কাটা গরম র‍্যাপার
ভাঁজ ভেঙে শুকোয় না শীতে কাবু বুড়ো রোদ্দুরে,
ক্ষয় করে উপেক্ষায় কুটিলের রসনার ধার।

আনন্দে ক্ষুধায় ক্ষোভে হাহাকার করে দিগ্বিদিকে,
তাড়ায় সূর্যের ঘুম জঠরের অজেয় জ্বালায়।
শোথ-শ্বেত শ্লথ হাতে আশাবরী উষা দেয় লিখে
আকাশে প্রভাত : তাই পৃথিবীর পঙ্কিল থালায়

বিগত রাত্রির বাসি উচ্ছিষ্টের সুস্বাদু প্রসাদ
জায়াহীন তারে সাধে শুদ্ধাচারী কপট বিমাতা—
সুন্দরী সৌখিন দিন,—আর তার বৃথা আর্তনাদ
ত্রিলোকে সান্ত্বনা খোঁজে!
বিকেলে মর্মর করে পাতা,
আলো নেভে, হানা দেয় তান্ত্রিক নিশির তিন ডাক।
সারারাত্রি শিরে তার পাতা ঝরে, সে ঘুমোয় : কাক॥

একটা নষ্ট ফল

আহা রে, তুই কে-ফল অকালে
কৃপণ ডালে ফলতে গিয়েছিলি !
কেউ এখানে ফলতে আসে না রে—
খোঁজে না কেউ বেদনা নিরিবিলি ।

ভিখিরিদের ভীত পায়ের ফাঁকে,
ব্যাভিচারীর পাপমেশানো পাঁকে,
ফুলের বেলা অবহেলায় ঢাকে,
ছি-ছি ছাপায় প্রাণের ঝিলিমিলি ।

তাপ জুড়োনো ঘাটের বারাণসী :
তুই এখানে ? কী দেখতে যে আসা !
কাঁকালে-সোনা নারীতে উর্বসী ?
বিশ্ব ভুলে বিধাতা ভালোবাসা ?

দেহের কোষে যা এনেছিলি তার
তীর্থে ভীড়ে দলিত সমাচার
পৌঁছবে না ত্রিদিবে, সংসার
বুঝবে না সে-অভিধানের ভাষা ॥

স্বগত

চাই না, চাই না, চাই না তোদের, ফিরে যা তোরা,
শ্রাবণ-শোভন গগনে পবনে অলস বিলাসে পালক ওড়া,
অমল নীলায় মোহিনী লীলায় পাল তুলে ভাস ।
আকাশ আমার কেউ নয়, সে তো দূরের আকাশ—

আরেক দেশের, আরেক গাঁয়ের, আরেক পাড়ার :
কত তার সখা চন্দ্রতারকা, নিদ্রাহারার
বন্ধুতা মেনে অপমান হবে ?

থাক-থাক, ঢের

হাসি-হাসি মুখ, আহ্লাদি ঢং দেখেছি তোদের
ফুটফুটে ফুল।

এই যে, বকুল, কখন এলে ?

কে না একদিন ছিলো তোমাদেরই প্রাণের দোসর ? দু'দিনে সে-ছেলে
পর হ'য়ে গেলো ! সাধু সাধু ! তবু কী যে ভালো নাম
মা-বাবা তোদের দিয়েছে, তাঁদের শতেক প্রণাম।

চাই না বৃষ্টি, চাই না দুপুরে ছলোছলো মেঘ।
নেবো না কুড়িয়ে সন্ধ্যার রেণু। যত ঝগড়াটি ঝড়ের আবেগ
ত্রিসীমায় আর দেবো না ঘেঁষতে। শিমূল শালিখ
ধিক্কার দিক, যত প্রাণ ভ'রে ধিক্কার দিক।

কত ভালো আমি বেসেছি তোদেরও, নিজের হাতের বাচাল আঙুল !
ফুলের শরীর ছেনেছিস তোরা, ছুঁয়েছিস তার জানুঢাকা চুল।
তার নীলখাম তোরা ছিঁড়েছিস, দিয়েছি ছিঁড়তে আমার আগেই :
বিশ্বাস নেই, নিজের শরিক যে-শরীর তাকে বিশ্বাস নেই।
বিশ্বাস নেই বিলাসী চোখেরে, হায়রে অন্ধ। সুরভিমত্ত
বিষয়ী নাসিকা, এই ঝরা বনে শোনাবো না কোনো পরমতত্ত্ব।
থাকো মূর্ছিত, থাকো ভাবে ভোর, স্বাধীন স্ববশ নির্বিশঙ্ক।
তোদের ছোঁবে না আত্মগ্লানির দীন হাতে ছানা পাপের পঙ্ক।
যখন চেয়েছো, যা চেয়েছো ঠোঁট, স্বার্থসাধক কান, ভীরু ত্বক,
সাধ মিটিয়েছি. ভাবিনি তোরা যে এত প্রতারক।
তোরা সৌখিন, তোদের কী দায়, তোরা তো বেকার।
সংসারে তোরা দিলিনে কিছুই, ইচ্ছে হ'লো না কিছুই শেখার।
আঁকিসনি ছবি, গড়িসনি গান, মৃত বিবর্ণ কঠিন পাথর
আঙুল বুলিয়ে হ'লো না কিছুই, কথা ছিলো রূপ হবে !

আজ ফিরে যায় দেবতার যত বর।

খার্সং-এ একটি মৃত্যু

খার্সং-এ সন্ধ্যা করলো, স্যানাটোরিয়ামে
তাকে শেষ দেখে এসে ফিরতি পথে ভাবি—
(পাহাড়ী রাস্তার বাঁকে হেনার সুরভিধারা নামে)–
কেন ছেড়ে যেতে হয় অসময়ে ধরণীর দাবি ?
মন্ত্রী কি মেয়র হবে ভাবেনি সে। তবে ?
মত্তপ মোটরে চেপে চাপা দেয়নি ভিখিরী ছেলেকে
ছলোছলো দুটি চোখ বুকে মেনে তবু যেতে হবে
অন্তদূরে ? শেষ দৃশ্যে অকম্পিত হাতে দেবে এঁকে
গিরিশিরে রৌদ্রআভা জাফরানী কুঙ্কুম ?

ভাবতে-ভাবতে দার্জিলিং। মন ক্লান্ত, চোখভরা ঘুম
কাল আবার যাওয়া আছে গ্যাংটক, অনেকটা পথ।
অন্ধকারে অজগর-ঝরনা ফোঁসে, চেয়ে দ্যাখো ছায়া
দৈত্যদানবের, যারা দিবালোকে পাহাড়পর্বত।

দুই দৃশ্য

সতীশের হৃদয়ের বন্ধু তারই নিজের হৃদয় !
চৌরঙ্গী সংসারে তারা দুই বন্ধু প্রাণখুলে হাসে।
অবিনাশ নলিনাক্ষ হৈমবতী কমলা অক্ষয়
জোড়ে-জোড়ে ছায়া খুঁজে পরস্পরের আশেপাশে
পিঁপড়ে হ'য়ে ভিড়ে যায়।
'কী করুণ দৃশ্য, ওহো, জানে না তো ওরা',—
সতীশ বন্ধুকে বলে, 'সব সখা-সখী কত অসম্ভব একা।
ঘন-ঘন কাশি পায়, আস্তাবলে ছানিচোখ হৃতপক্ষ পক্ষীরাজ ঘোড়া !
নিতান্ত মিলতেই হবে যদিও দু'দণ্ড তরে দেখা ?'—

এই ব'লে সে তখন হৃদয়ের বন্ধুটির হাত
আরো শক্ত চেপে ধরে, নিরিবিলি উষ্ণতার কোণে
টেনে নিয়ে যায়, তার কানে জপে : 'শুনো না হ্যাঙাৎ
পরের মন্ত্রণা তুমি।'
মাকড়সা রাত্রির জাল বোনে।
অবিনাশ-নলিনাক্ষ হৈমবতী-কমলার চোখের চৌকাঠ
ছুঁয়েছিলো পার হ'য়ে অক্ষয় প্রেমের বালিয়াড়ি,
ভেবেছিলো পাওয়া গেছে চিরন্তন গৃহস্থের বাড়ি :
অন্ধকারে হাতে ঠেকে বন্ধ ভারি নিরেট কপাট!

ভিন্ন ঘরে রাত বাড়ে, ঠাণ্ডা হয় সতীশেরও পাশে শূন্যখাট॥

একটা স্বদেশী নাটক

১

'মহান তাসের ঘর, এরই মধ্যে যজ্ঞ জ্বালা চাই :
পবিত্র বিকেল ছ'টা, সংকল্প নিলেম, তোমরা মনে রেখো ভাই।
এই ঘর তাসে গড়া, তবু এরই অলীক দেয়ালে
স্বপ্ন চরিতার্থ হবে অনাগত পোটোর খেয়ালে।
অচিরাৎ জরাজীর্ণ তম্বুরার তার
সুরের সম্যক-নাদে ভ'রে দেবে বেবাক সংসার,
এ-বিশ্বাস চিত্তে নিয়ে এসো আজ ভঙ্গ করি সভা।'—
বাহবা, বাহবা।

২

সভা শেষ। দেখি যদি সিগারেট কাছে আছে কারো।
আনিনি ট্র্যামের পাশ, ওহে কেউ দু'চার আনা ধার দিতে পারো?
আবার চা কেন, ভাই! এ-বৃহৎ কাজে
এইসব তুচ্ছ দিকে এখন কি মন দেওয়া সাজে?

অপূর্ব কুশলী শিল্পী এলো এক, শূন্যে তোলে ছাদ :
গম্বুজে আকাশ ছোঁয় দেখতে-দেখতে তাসের প্রাসাদ।
এখনো দেয়াল বাকি, সবশেষে গড়া হবে ভিত।
রক্ষা পাবে সনাতন রীত।
'এরই মাঝে একদিন যজ্ঞ জ্বালা চাই—
মনে রেখো, মনে রেখো ভাই।'

৪

গিলে লজ্জা ভয়,
অতীব বাচাল এক জানতে চায়, কখন সময়!
গোলামের ঠোঁটে জ্বলে ধিকিধিকি শস্তা সিগারেট,
বিবিদের আশেপাশে বাবুদের রপ্ত এটিকেট
সন্ধ্যার সুরভি খোঁজে। কোথায় যে তাসে গড়া ঘর!
অন্ধকারে শোনা যায় অনর্গল প্রবক্তার স্বর :
'ধৈর্য ধরো, বন্ধুগণ, তাসপ্রাসাদ হ'লো না, তাতে কী?
তাই ব'লে দৈববাণী কখনো পারে না হ'তে মেকি।
আছে ঘাস লতা পাতা, দেশলাই দিয়ে যজ্ঞ জ্বালো।'
বিবিরা অগত্যা লাল, গোলামেরা কোথায় পালালো।

কবিতার খসড়া

ইত্যাদি ইত্যাদি শুধু গোধুলির বিখ্যাত ভজন,
বর্ষার বিলাপ, কিংবা সাতবাসি ফুলের পাঁচালি,
কিংবা দ্রুত স্বরবৃত্তে হা-রে-রে-রে, দে রণ, দে রণ :
ওড়েসাড়ে সবই দ্যাখো মান্ধাতার আপালি-চাপালি!
এই শুধু? শুধু এই? এ-বস্তু কি কবিতার নামে
পেরেছে পাঠাতে কেউ সার্থকের তীর্থগামী খামে?
সে-চিঠি হয়নি বেয়ারিং?
উত্তর জানে না কোনো এভারেস্টজিৎ তেনজিং।

ভয়

সবাই পারে না, হয়তো একজন মাতাল বিস্ময়
'বিশ্বে মৃত্যু নেই আর'—এই ব'লে প্রলয় পেরিয়ে,
মানহাটানে হাসপাতালে মৃত্যুকেই করেছিলো বিয়ে :
তাঁরই থাকা হোটেলেই থেকেছি, কাটেনি মনে ভয়।

বিখ্যাত বীরভূমে স্নিগ্ধ শালবীথি, লাল পথে গান
জ'পেছে অমর্ত্য আশা : এ-আঁধার ক্ষয় হ'য়ে যাবে।
কী ক'রে ডোবাই প্রাণ মৃত্যুময়তার অপলাপে ?
অথচ কী ক'রে বলি—তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান ?

কেননা গলিতে ছায়া, অতর্কিতে আগন্তুক হাত
কাঁধ ছোঁয়, মাটি ফুঁড়ে চেঁচায় অচেনা কারা শব !
থমকে যায় অপ্রতিভ জারুলে বেগনি কলরব,
বিকেলের রাজ্যপাট লুটে নেয় নিষ্প্রদীপ রাত।

তবু নাকি মধুময় এ-বিশ্বের ডোবাভরা লাশ !
শিশুর ঝলসানো চোখ তবু নাকি ক্ষমা ক'রে যাবে !
পবিত্র পদ্মের দল জিতে নেবে নররক্তস্রাবে,
প্রাণের নীলিমা নাকি ধুয়ে রাখবে সঞ্চয়ী আকাশ !

কী জানি, হয়তো তাই। ক্ষমা, জয়, সঞ্চয় অপার
আছে জেনে ঋষিকেশ অবিচল প্রলয়ের ত্রাসে !
মাতাল বিস্ময় তাই মানহাটানে হাসপাতালে হাসে,
মৃত্যুকে অঙ্গুরি দিয়ে গায় : 'বিশ্বে মৃত্যু নেই আর'।

পিতার তালুক গেছে, তোমার রাজত্বে আমি জানি
উদরান্নে টিঁকে আছি, ছোট মুখে সাজে না বড়াই।
ব্যাপ্ত তুমি চরাচরে, তাই আমি তোমাকে ডরাই।
তোমার রাজস্ব জেনো যথাকালে পাবে, মহারানি।

আত্মগ্লানি

দাঁড়াও পথিকবর, শোনো বন্দী নাবিকের গান :
ডাঙায় ভাসে না তরী, কী তপ্ত বালির চড়া
শহুরে সাংঘাতিক বর্তমান—
করি সংশয়,
বললেও তা হবে না প্রত্যয়।
গলিতে পাঁচসিঁড়ি উঠে দোতলার চিলতে ঘরময়
ইতস্তত দেখা যায় কাল্পনিক মাথার চুল ছেঁড়ার প্রমাণ।
অমৃতস্য অধম পুত্র, সাতসমুদ্রে বিশ্রুত নাবিক
যে-ছিলো একদা, আজ তার দুঃখ করো অবধান।

কাঁটায়-কাঁটায়, এ কী, রাত দুপুর ?—থাকগে, থাকগে,
যুদ্ধের হুল্লোড়ে কেনা সাতসিকের জাপানি ঘড়ি,
মরি মরি, সে-ও চোখ রাঙায় !
করো কী করবে, হবে যা আছে ভাগ্যে।
মশায়, কার তোয়াক্কা করি ?—
(যদ্দিন না শেষ বিদায় নিচ্ছি ভবলীলা সম্বরি।)

মাথাটা দপদপ করছে, শিরঃপীড়া বুঝি !
হেনকালে ভেবে দ্যাখো, মন,
কী গভীর নিদ্রামগ্ন সুখী বালকেরা,
নিদ্রামগ্ন শান্তিনিকেতন।

পথিকবরদের প্রতি করি তবে শেষ কনফেশান :
যৌবন করেছে বধ যেই সব মহাপাপী খুনী
বিশুষ্ক তাদের ভাগ্যে কল্যাণী নিদ্রার সুরধুনী।
বাকিটুকু বুঝে নিও—কেন যে দেয়ালে দিন গুনি :
কবে আসবে—আসবে তো ?—কারামুক্ত ১৪ই এপ্রিল ?

তদ্দিন সকাল সন্ধ্যা, চায়ের বিকেল আর
উড্ডীন আকাশমুখী চিল
ব্যর্থ হোক, আঁটা থাক দরজায় খিল।
বসন্তের বিখ্যাত নিখিল
ভগ্নমনে ফিরে যায় যাকগে, পাবো পুনর্দর্শন :
সাহিত্যমেলার ভিড়ে
সে-নির্লজ্জ ফিরে-ফিরে
যাবে না কি শান্তিনিকেতন ?

দুঃখের দিনের কবিতা

বৃষ্টি থামে প্রলয় শেষে, আকাশ মোছে আঁখি ;
ছাতায় ঢাকা বাঁকা গলি পরে আলোর রাখী ?
স্বপ্ন থেকে জেগেই দেখি করাল অন্ধকার
ভুবন ডোবায়, স্বর্গমর্ত্যপাতাল একাকার।
আতঙ্কে হিম তীক্ষ্ণ চোখে তাকাই চতুর্দিকে—
যোজনজোড়া অগাধ ঘুমে আকাশ-তারা ফিকে।
চাঁদের নৌকো তলিয়ে গেছে, লোনা ঢেউয়ের জলে
ঘাটে-ঘাটে অশরীরী ছায়াভাসান চলে।

ভোর কি এদেশ ভুলে গেছে ? কোথায় ঢালু উপত্যকার ঘাসে
সূর্য আলোর ধেনু চরায়, বাজায় বাঁশের বাঁশী ?
কোথায় সে-পথ রাঙাধুলোর ? বাঁয়ে কিংবা ডাইনে ?
চাইনে—চাইনে, অনিশ্চয়ের দোলায় দুলতে চাইনে।
কঠিন পথের কাঁটায় যদি পা কেটে যায় যাক না,
চাইনে আমি মনভোলানো আকাশচারী পাখনা।
শুনেছিলাম তীক্ষ্ণ নখে অন্ধকার ছিঁড়ে
টুকরো ক'রে ফেলতে পারে মায়াহ্রদের তীরে
অবতীর্ণ ভোরের আলো : কোথায় তুমি, পাখি ?
কোথায় তুমি, ঊর্ধ্বমুখে দু'হাত তুলে ডাকি।

চাইনে আমি তিমিরতলে ছায়াপথের স্বস্তি।
বলো, কোথায় উদ্ভাসিত প্রশস্ত পথ অস্তি?

উদয়সাগর, উদয়শিলা, দেখতে কি পাও দীপ্ত রথের চাকা
দিগন্তরে সোনার রঙে আঁকা?

প্রশ্ন : ১

ফিরে দাও, ব'লে পা ছড়াস যদি
উজানে যাবে না জীবনের নদী।
ভেবে বল তাই, সত্যি কী চাস?
উড়ে যাওয়া দিন, পুড়ে যাওয়া ঘাস,
যদি ঘিরে আসে তোর চারপাশে,
খুশি হবি? যদি আসে সেই সবই?
বৈশাখে জাগা ধূ-ধূ নদীচর,
ছায়ায় ছোপানো মাটিলেপা ঘর
ক'টি মানুষের, আপন দেশের?
জানলা তাকানো চোখে চাপা জল
বৃষ্টি বিকেলে হোক বিহ্বল
আরো একবার, তুই তাই চাস?
পাহাড় পেরিয়ে যত শাদা হাঁস
উড়ে গিয়েছিলো কোনো এক শীতে
কোনো এক মাঘে কতকাল আগে,
আবার তাদের ডাকবি কি ফিরে
বনতালশির দীঘিটির তীরে?
সত্যি কি চাস আবার আসুক—সেই তার কী যে নাম,
ছিপছিপে মেয়ে, চোখে-চোখে হাসি, প্রাণের আরাম?
এতকাল পরে চিনতে পারবি সে এসে দাঁড়ালে
যে গ্যাছে হারিয়ে অন্ধকারের চিকের আড়ালে?

প্রশ্ন : ২

মনের খেয়ানে নেই নেই চাঁদ তারা নেই,
নেই আর জানালায় আলো আসা।
সকলি কি ফিরে দিতো ধরণীর এক কোণে
একটি মেয়ের চোখে ভালোবাসা?

পরিণাম

মায়া হরিণ, সোনা হরিণ, তুলিতে আঁকা আঁখি,
তাকে যে আমি খুঁজেছি কতবার।
নীরব বন, নিবিড় বন, গহন বনে তাকে
কখনো যেন শুনেছি আমি, কখনো যেন দেখেছি ছায়া তার।

তাকেই ভেবে আকাশ-ঝরা রুপোলী ঝর্ণার
শুনিনি আমি হাসি,
দেখিনি কবে অস্তাচলে আকাশ দিলো ছেয়ে
নিষাদনীল মেঘেরা রাশি-রাশি।

শিথিল দেহ, অবশ প্রাণ, রক্ত ঝরে পায়ে,
কপালে ঝরে ঘাম।
রাত্রি আসে, সূর্য নেই, সময় নেই আর—
যখন ছিলো ভাবিনি পরিণাম।

এখন সব পাখিরা চুপ, আকাশে কাঁপে তারা,
অন্ধকার খালি
এ-বন থেকে সে-বনে যায় শব্দহীন হাতে
বাজিয়ে করতালি।

এলো না তবে, দিলো না ধরা, মিলালো মায়ামৃগ ?
হায় অতনুর ব্যর্থ তবে তূণ।
অতর্কিতে অট্টহাসি সহসা খুন করে
রোমাঞ্চিত প্রাণের ফাল্গুন।

আকাশময় সে-পরিহাসে তারারা যোগ দেয়,
হাওয়ায় শুনি হা—হা—,
রাতের পাখি সুযোগ বুঝে উচ্চে তুলে স্বর
ছড়ায় 'আহা—' 'আহা—'।

আলোছায়ায় কত হরিণ নিলো বাঘের থাবা,
কত হরিণ ঘাসের বনে এলো,
কত হরিণ শিং ঘ'সেছে বনের গাছে-গাছে,
আমার মনে বিষাদ এলোমেলো।

বিদায় তবে অভয় বন, নিঃশেষিত তূণ,
সাঙ্গ পরিক্রমা।
বিদায় তুমি কে মায়াবিনী, হে রঙ্গিনী নারী,
বিদায় প্রিয়তমা॥

বার্তা

শরৎকালের নিশান্তে এক
সত্যিকারের চাঁদ উঠেছে—
দেখতে পেলেম,
সত্যিকারের চাঁদ উঠেছে—
তাই তোমাকে বলতে এলেম :
হায়রে হায়,
তুমি তখন গভীর নিদ্রাগতা !

খুশির সকাল-চায়ের বেলায়
সোনার রোদটি উপচে পড়ে,
মিশে যাচ্ছি, পুড়ে যাচ্ছি
প্রাকৃতিক এই নেশার জ্বরে,
বলতে এলেম :
তুমি তখন দিনের কর্মনতা।

পুরানো প্রথা

প্রগাঢ় একটি মেয়েকে সে ভালোবাসতো,
একদিন আর বাসলো না :
তার যৌবন গেলো দূরে।

শীতল একমাঠ ঘাসকে সে ভালোবাসতো,
একদিন আর বাসলো না :
রোদে সবুজ গেলো পুড়ে।

আপাতত তমস্বিনী

রাতের সাগর, তারো কালো জল আলোড়িত হয়
নক্ষত্রের দীর্ঘ স্নানে দৃষ্টিসীমাময়।
ভোরে রোদ উঠে এসে মায়া হাতে মুছে নেবে সব,
ফুরোবে সকল কালো, আকাশে বিদীর্ণ কলরব।
তাহ'লে বুকের শাদা হাড়ে
অনিকেত রাত্রি কেন বাড়ে ?

এখনো পারিনি ভুলতে, গোপনে এখনো মনে থাকে-
চিরস্থায়ী ব'লে ভাবি যাকে
হয়তো বা ধ্রুব নয় অনাকার সেই অন্ধকার :
প্রমাণ থাকবে প'ড়ে অবশিষ্ট একমুঠো হাড়
অপার্থিব কোনো এক রৌদ্রময় শুভ্রতার সুখে
চিরতরে খুলে যাওয়া অতিকায় দ্বারের সম্মুখে।

আপাতত পাঁজরের তলে
তমস্বিনী ভিন্ন কথা বলে !

অজ্ঞাতবাসের ভূমিকা

হায়, ঝড় নেই। বিশ্ব ছেয়েছে কেবলই ঝরা পাতা,
দিনরাত ঝরে, ঝ'রে যায়।
বিশীর্ণ বিপুল বন, শাখাশীর্ষে পাতুক পল্লব
আঁধারে আলোতে বাগিচায়।

বনে এত প্রেত কেন, এত শাদা কঙ্কালের দাঁতে ?
চোখের বিবরে এত সাপ ?
কনকপরীরা কেন এ-কাননে ডাইনী হ'য়ে যায় ?
জ্যোছনা ঝরে শুধু মনস্তাপ ?

সব বাঘ ম'রে গেছে, ফিরে গেছে সব দেবতারা,
গেছে সব হলুদ, কপিশ।
খোসার আড়ালে ফল কখন প'চেছে ডালে-ডালে,
সব জাম কামরাঙা বিষ।

ঝড়েরা উধাও, শূন্যে কোনো মেঘ ফ্যালে না নোঙর

অবজ্ঞাত বিধানকর্তার
হাহাকার থেমে গেছে, স্তূপাকার ঝরাপাতা ঢাকে
তার জীর্ণ পাঁজরের হাড়।

সাঙ্গ বনবাস। বাকি অজ্ঞাতবাসের বারো মাস :
নৃত্যগীত বিরাট-সভায়!
কোথায় লুকোবে তূণ? হায়, সব শমীশাখা থেকে
অন্তহীন পাতা ঝ'রে যায়॥

পুনর্বিবেচনা

শরৎকালের চেনাদিন আর খুশিভরা ঝরঝরে কিরণে
মিলে মিশে গেলো এক হারাকাল আর এই
উজ্জ্বল প্রাকৃতিক হিরণে।
নবীন পল্লব,
কালো আর নীলকণ্ঠী ছোপ দেওয়া দোয়েলের আপন গলার স্বর
স্নেহের সজীব মাধুর্যে
শুকনো মনকে তাজা আশ্বাসে করছে ভরপুর।
নানাখানা হাহাকার, বাঁকানো মনের চাপা কান্না
দিকে-দিকে দাবি তোলে : 'এ-অকালে সুর নয়, স্বর নয়, গান না।'

অথচ ঘুমের আগে ভয়কে কাল যখন দেখি
জৌলুষ মাখানো লক্ষ তারার দিকে চেয়ে
তখনো ভুলতে পারিনি যে অবিশ্বাস্য আধখণ্ড চাঁদ
মরা দেশকে অল্পবিস্তর ছিলো ছেয়ে।
তারপর এই সকালবেলা যখন ফুরিয়ে যাচ্ছে রামধনুর মতো,
অর্বাচীন কাশফুলেরা প্রণামের ছাঁদে মাথা করছে নত,
কার যেন পুজো হচ্ছে কোথাও
দুঃখী ও দুর্লভ এই শরৎকালের ভোরে।

কুণ্ঠিত উপোসী মন নিয়ে ছোটলোকের মতো, বলো,
কে থাকতে চায় প'ড়ে ?

প্রাণের মিত্র

যাদের জেনেছি সকলের চেয়ে আপনার
তারা চির কেউ নয়।
বসন্তভোরে এ-দিগ্বলয়,
মাঠে রোদ্দুরে শুয়ে-থাকা ঘাস,
অভয় আলোর অকূল আকাশ,
প্রাণের কুলায়ে পাখিদের গান,
অবুঝ পাঁজরে বেঁধা অভিমান,
নিরিবিলি শাদা ঐ বাড়িটার
খোলা জানালায় সকালের রোদে
সবুজ আভার রচিত চিত্র—
জানি মায়াময়, তবু এই সবই প্রাণের মিত্র।

স্মৃতির সুতোয় যত গাঁথি হার
জানি একদিন হারাবে সবই,
সব ছবি, সব ভালো ছবি, সব কালো ছবি।
শুধু চ'লে যাওয়া, আর কিছু নয় :
তাকিয়ে দেখার বেশি অধিকার
দেবে না সময়।
দেখতে-দেখতে পাতা ঝ'রে যায় ফাঁকা দুপুরের
চোখে জল আসে গাঢ় বেদনায় অজাত সুরের।
ভেসে ওঠে মনে কোনো অজস্র কালো কুন্তল,
দেবতার বরে কার বক্ষের দুটি কাঁচাফল
ভালোবেসেছিলে, সে কি অক্ষয় ?
কী হয় না-জেনে, শুধিয়ে কী হয়।

তারকার সভা জ্যোতিহারা হ'লে
কোথায় মিলায়? ছায়ায় ছায়া।
সে-ক্ষতি যেদিন আসবে আসুক,
আজ বৈশাখে বুক ভরে সুখে
অলীক মায়া।

নবীন কবির প্রতি

বয়স যখন পঁচিশ পেরোয়, সবাই যখন মানে,
বয়স্কেরা ঈর্ষা করেন, কারণ এ-অঘ্রাণে
তাদের ডালে খ'সবে পাতা তোমার ডালে জাগবে যখন কলি ;
ছাপতে যাবে কত কবির পোকায়-কাটা ম্লান রচনাবলী ;
ছাড়বে কত শীর্ণ শাখা হরিৎ পাখির ঝাঁক :
তোমার বনে অকারণে শত পাখার ঝাপট,
হাজার হরিয়ালের ডাক !
(হয়তো কিছু ছায়ার আনাগোনা !)
স্বর্গে-মর্ত্যে কুচক্রীরা তখন ব'সে যতই বুনুক জাল,
প্রাণকে জপাও—কিছুতে দমবে না।
পকেট ভরা জোনাক নিয়ে, অনেক ছুটে ঘেমে,
আর একটা শীত আসার আগেই স্বর্গ থেকে নেমে
আসতে হ'লে এসো, কিন্তু ততক্ষণ তো থাক
সাঁঝসকালের অন্ধকারে ম্লান দ্বিতীয়ার দেবী এবং
গাল রঙানো কথা বলার ফাঁক।
নেভে যখন নিভবে আগুন পঁচিশ ডুববে ত্রিশে।
আপাতত ফিঙের ঝুঁটি নেচে বেড়াক বুনো ঘাসের শিষে ॥

নগরে নবীন মেঘের চূড়ায়

নগরে নবীন মেঘের চূড়ায় অপরাহ্নের আলো ;
গতকৈশোর চঞ্চলতায় কেন যে উতলা অন্তর চমকালো ।
হায়রে ভুবনমনভুলানিয়া
ক্ষণিক দিনের অঙ্গীকার
এই অবেলায় যারা মনে আসে
তারা কে কোথায় সঙ্গী কার !
কোনো স্বাক্ষর থাকে না কোথাও,
দেনা হ'য়ে যায় শোধ ।
আকাশের গায়ে সকালে বিকেলে
মুছে যায় নানা রোদ ।
তবু প্রসাধনে রঞ্জিত মেঘে
কিছু লেখা থাকে সান্ত্বনা :
আহা তারা থাক, কোনোকালে যারা
জীবনের জরে ক্লান্ত না ।

ফাল্গুন ১৩৫৯

১

বেশ জায়গা পৃথিবীটা । ফেব্রুয়ারি । বৃষ্টি বা কুয়াশা
পলাতক কিছুকাল । শুধু যদি দুঃখী কোরিয়ায়
রাক্ষুসে নিধনপর্ব শেষ হ'তো, চীন দরিয়ায়
থামতো মানোয়ারি প্যাঁচ, তাহ'লে, ফাল্গুনে করি আশা,
কলেজী বক্তিমে ভুলে ভনিতাম—'খাসা বেঁচে আছি ।'
অকারণে দুই বেলা সূর্য ওঠে, সূর্য অস্তে যায় :
পারি না, পারি না হ'তে যৌবননিকুঞ্জে মৌমাছি ।
আপাতত এক ফাঁকে শান্তিনিকেতনে,
যাওয়া যাক সাহিত্যমেলায়

২

কেমন, বলিনি? দ্যাখো, বসন্ত ফোটায় গাছে ফুল।
(ধন্যবাদ গৌরী দত্ত, শ্রীনিমাই চট্টোপাধ্যায়।)
তিপ্পান্ন সালেও আজো ফাল্গুন কী-রঙ্গ দেখায়
বিশ্বাস হ'তো না যদি না-দেখতুম জলন্ত শিমূল
বীরভূমে অজয়তীরে (সাক্ষী থাকে অম্লানকুসুম ;—
সাক্ষী থাকে আরো এক অধ্যাপক, মাথাজোড়া টাক,
সারা রাস্তা ভদ্রলোক, বাপরে বাপ, কী বকবকুম!
কিন্তু এবে পরচর্চা থাক।)

৩

তাহ'লে ফাল্গুনে দেখছি—আরে, তাই তো, সত্যি যে পলাশ!
এতো লাল?

ঐ কি রঙ্গন?

পৌঁছলাম শান্তিনিকেতন।

৪

হাসিমুখ, চেনা চোখ, সাহিত্যমেলায় তিন দিন:
গানগল্পহৈচৈ, ঘণ্টা গেলো কাজে বিনা কাজে।
সন্ধ্যায়, গভীর রাতে ধ্যানলগ্নে ক্ষীণ সুরে বাজে
অকূল আকাশে কোন বীণ।

৫

কী ভাগ্যে আবার দেখা হ'লো এ-জন্মেই!
যুগলে নিঃশব্দ হাঁটা খোয়াই ছাড়িয়ে, কারো মুখে কথা নেই।
কিংবা শত লক্ষ কথা আছড়ায় দুয়েরই মৌন মনে!
সেই তো মঞ্জরী দোলে এতকাল পরে, হায়,

বিখ্যাত উদাস শালবনে!

রবীন্দ্রনাথেরই ভাষা বাংলার দুই তীরবাসী
অগ্রজ অনুজ কতো লেখককে এনেছে পাশাপাশি।
'—হ্যাঁ, আরো দু'দিন আছি। সভায় যাবে না? প্রায় ছ'টা!'—
আকাশে মিলিয়ে এলো সূর্যাস্তের বরণীয় ছটা।

রাত দেড়টা। কফি-পর্ব শেষ হ'লো প্রাক্তনীর ছাতে
একাকী বিষণ্ণ জ্যোৎস্না দাঁড়িয়েছে দূরে লালবাঁধে।
'বসন্ত সত্যিই আসবে ? কী দরকার এসে ?'—
সুভাষ পড়লেন মৃদু হেসে।
হ্যারিকেনে মৃদু আলো, বড়ো হাওয়া, খোলা ছাত।
কিন্তু কী মশার উৎপাত।

৭

পবিত্র সকাল, কতোকাল দেখিনি যে !
অবাধ্য দু'চোখ যায় থেকে-থেকে অকারণে ভিজে।
ঘুম ভেঙেছে সেই কখন, যাই দেখি চশমাটা পবি :
ঐ ঐ-তো ছিলো মশারির দড়ি।
না-পেয়ে কাল সারারাত কী কষ্ট।
সকাল সাতটায় দেয়ালে ঝুলছে পষ্ট !

৮

'মন তুই পড়গা ইশ্‌কুলে—
নয়তো কষ্ট পাবি শ্যাষকালে—'

নেচে-নেচে বাউল গাইছে, একতারা ঘুঙুর হাসিচোখ
রোদ উঠেছে, চায়ের বেলা—
হঠাৎ ভুলতে চাই ইহজন্মের শোক।
এমনকি ভুলতে চাই আজ তাকেও।—
তবু, তবু কে আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকো ?

৯

তারপর শেষ সন্ধ্যা
শেষ গান
আলো নিভলো
উঠি :
ফুরিয়ে গ্যালো ছুটি।

বৃক্ষ

দিন চ'লে যায়, তুমি তাকাও না, ঋতুর নিয়ম
ঝরিয়েছে শিরে তার ঠাণ্ডা বৃষ্টি, হাওয়ার চামর
বীজন ক'রেছে তাকে, কেড়েছে হলদে পাতা যম।
একা সে নিশীথ রাত্রে শুনেছে মেঘের ক্রুদ্ধ স্বর।

তোমারই সে প্রতিবেশী, চেনে তাকে অতিথি পাখিরা।
কী সুস্থ নিয়মে বাঁচে, জীবন যদিও মৃত্যুমুখী।
অশোক আনন্দ তাকে মাতৃস্নেহে মুছে দেয় পীড়া,
পিতা সূর্য শুশ্রূষায় করে তাকে নিরাময় সুখী।

জীবনে সংগ্রাম তারও, লক্ষ বাহু মাটির গুহায়
রস অন্বেষণে রত, গ্রীষ্মের দাহনে ম্রিয়মাণ
সে-ও প্রতিবর্ষে। তবু জরাজয়ী মালিনীর প্রায়
যথাকালে মালা গাঁথে।
তুমি তার শোনো না আহ্বান!

শান্তিও যদি

শান্তিও যদি সিংহের মতো গর্জায়,
তাকে ডরাই;
ভালুকের মতো আগলিয়ে থাকে দরজায়,
তাকে ডরাই;
ঈগলের মতো বাঁকা নখে পড়ে ঝাঁপিয়ে,
ডুকরিয়ে ওঠে গৃহস্থপাড়া কাঁপিয়ে,
বুড়ি ছুঁতে গিয়ে অবেলায় পড়ে হাঁপিয়ে,
তাকে ডরাই।

আমার শান্তি সাধু ভৃত্যের মতো,
সংসার দেবে পাহারা ;.
চোখেমুখে হেসে বশে রাখবে সে সতত
বাস করে যারা এ-পাড়ায় ।
কাকপ্রত্যুষে সাড়া পাবো তার জেগে,
প্রস্তুত রাতদিন সে,
আঁধারে পরাবে সরু ফিতে লণ্ঠনে,
আলোকে হবে না হিংসে, এবং
কিছুকে পাবে না ভয় :
দুঃখের দিনে এনে দেবে প্রত্যয় ।

সে-ই তো আমার সাধ্য শান্তি,
বিশ্বাসী প্রভুভক্ত ।
অনেক কালের পুরানো সে-লোক,
পরস্পরের জানি সুখ শোক,
দু'জনের আশা-নেশা-আনন্দ
চিনিয়ে দিয়েছে বিজ্ঞ সময় ।
আমি, সে আমার প্রহরী, উভয়ে
ডরাই লড়াই রক্ত ॥

শেষ বি. এন. আর. মেল

পৃথিবীর সব হাওয়া ছিপ ফেলে আড়ে ব'সে আছে,
গড়ালো দুপুর ।
কোনো মাছ চারে নেই, খাড়া ছায়া ক্রমে হেলে যায়,
ফিরে আসে দূর
অসীমের উঁচু ডাঙা ঘুরে দেখে ক্লান্তডানা চিল
শিমূলের শীর্ণ ডালে । অতিকায় রোদে মেলা নীল

আকাশে একাকী বড়ো।

পথঘাট শুয়ে আছে, আর

নদীর প্রচ্ছন্ন তীরে ঠোঁট চাটে মুগ্ধ জল,

শোনে তার অভ্যস্ত আহার—

উজ্জ্বল রূপোলি বালু—অবিরল ঝরে—ঝ'রে যায়।

এখন বিকেল।

জানি না কোথায় তুমি, কে তোমাকে নিয়ে গেলো,

নিলো শেষ বি. এন. আর. মেল।

নিমন্ত্রণ

তুমি এসো সখি, বাল্যের সহচরী,
মালা নেই, কিছু নেই প্রেম উপচার,
কল্পান্তের দুর্যোগে ঘর করি,
(ঘরই বা কোথায় ? খ'সেছে দেয়াল, দ্বার
জন্মের মতো খুলে গেছে, সহচরি।)

তুমি বলেছিলে, সময়ের সেবা-হাত
আরাম করবে হৃদয়ের পীড়া যত !
কালের আপন শিরেই বজ্রাঘাত
হবে যে সে-কথা জানতে না অন্তত।
মূর্ছিত তার শয্যার দিকে চেয়ে
মনে হয় বুঝি কাটবে না কালরাত।

চোখে আলো এনো, হাতে এনো শুশ্রূষা,
হয়তো তাহ'লে শেষ হবে শর্বরী।
আবার আকাশে হাসবে তরুণী উষা
একবার যদি তুমি হাসো, সহচরী।

তুমি কী সুন্দর

তুমি কী সুন্দর তাই ভাবি।
তোমাকেই করা সাজে মর্ত্যলোকে অমরতা দাবি।
তোমার হেমন্ত দূরে, দূরে শীত, আকাশ উজ্জ্বল :
তোমাকে সাজে না করা ছল।
দুরাশা রাখিনি মনে, জীবনের অগণিত ক্ষতি
যদিও সহসা আজ এক ঝাঁক উড্ডীন প্রজাপতি !
যত ক্লেশ, যত ক্লান্তি, ভয়,
যৌবনের যত অপচয়,
সব মিথ্যা অপগত তোমার কারণে একদিন।
তুমি কী সুন্দর, তাই কী সুন্দর আকাশে আশ্বিন।

যে নেই ভেবে

দিন কেটেছে এলোমেলো
ঘুম দিয়েছে রাত :
হার মেনেছি যখন, দেখি
এ-জীবনের অনেক মেকী
আড়াল করে অদৃশ্য কার হাত !
অদৃশ্য কার হাত ?

কোনোদিন কি জেনেছিলেম
এ-হাতখানি তারই,
যে নেই ভেবে আকাশখানা
হয়নি ডেকে ঘরে আনা,
হয়নি দেওয়া সাতসাগরে পাড়ি,
সাতসাগরে পাড়ি ?

যখন আমার সময় যাবে

যে-পথ দিয়ে যায়
নির্বাপিত গ্রহতারা
আগুনহারা আলোকহারা,
লিখবে সিঁদুর ভোরের আলো
সীমন্ত সীমায়,
জেনেছি, কার সীমন্ত সীমায় ॥

কেন

এই ভোর, এই রাত
কার হাতে মুছে যায় !
দিন কাটে ছলনায়,
কোনো প্রত্যাশা নেই।
হায় কেন সব কথা
প্রকাশের ভাষা নেই !
কেন নীল মেঘ ডাকে,
শালবনে হাওয়া হাঁকে,
কেন সব প্রজাপ্রতি উড়ে যায় ?

দূরে মর্মরিত বন

ঋতুর, না জীবনের ? শেষ বৃষ্টি বুঝি ঝ'রে যায়,
ফুরালো মৌসুমী।
নগরীর জনরোলে
কখনো কি মন ভোলে ?

নিদ্রায় উতলা করে
মর্মরিত দূর বনভূমি,
আকাশ দাঁড়ায় পাশে যার,
নদী ঘুরে চ'লে যায়,
দুই তীর ছায়া অন্ধকার।

কেন যে এখানে আছি, মৌসুমীর হ'লো অবসান।
আমার ইচ্ছার শত্রু, বিশ্বাসঘাতক এই গান
কেন যে শোনাই।
নগরীর জনরোলে
কখনো কি মন ভোলে?
উতলা বুকের রক্তে
তাই অবিশ্রাম যাই যাই।
রাত্রির চোখের জলে
ভেসে যায় যা ছিলো, যা হবে।
দূরে মর্মরিত বন
স্বপ্নে হানা দিয়ে যায়,
অন্ধকার ডোবে কলরবে।

ডিওটিমা

(হোল্ডারলিন থেকে)

তোমাকে বোঝে না এরা, তিতিক্ষায় স্তব্ধ তুমি তাই
আজ এ-মধুর দিনে, আলোকিত ধরণীর পানে
গরিয়সী তুমি, বৃথা নীরবে তাকিয়ে আছো, যদি
স্বজনের দেখা পাও, যদি আজো থেকে থাকে তারা,
সেই সব নৃপতিরা, যারা ভ্রাতাসম
অথবা সখার মতো, যেমন কাননে তরুশির,
একদিন জেনেছিলো প্রেম, জন্মভূমি,
এবং বিচ্ছেদহীন স্বর্গের আশ্লেষ।
এখনো ধেয়াও নাকি তোমার স্পন্দিত বক্ষে
জেগেছিলো যারা কৃতার্থেরা ?
এমনকি রৌরবেও যেই বিশ্বস্তেরা একদিন
অমলিন আনন্দ এনেছে ? মুক্ত যারা,
দেবতা-প্রতিম যারা, নম্র, মহাপ্রাণ, যারা গত ?
কেননা বিলাপ প্রাণে থামে না যদ্যপি থাকে
বিলাপের হেতু,
প্রাচীন নক্ষত্র নিত্য যে-ই শোক অনির্বাণ রাখে,
নিবৃত্তি জানে না কভু যে-মৃতের শোক।

কাল তবু নিরাময় আনে, অমর্ত্যেরা
আজ আরো বলীয়ান, দ্রুত।
এ কি নয় প্রকৃতির চির আনন্দিত স্বত্বে অধিকার দাবি ?
মৃত্তিকার স্তূপ পুন সমতলে মেশার আগেই
সমাগত কালান্তর, প্রিয়তমা, আমার ক্ষণিক
এ-গানও করেছে লক্ষ্য ভাবীকাল, তোমারই প্রতিমা,
ডিওটিমা,
বীর, দেবতার পাশে যবে অধিষ্ঠিতা।

উইলিয়াম ব্লেক-এর দুটি কবিতা

১. বাঘ

বাঘ, বাঘ, তুমি রাঙা অঙ্গার,
জ্বলো অরণ্যে ঘন তমসার।
কার হাত চোখ মৃত্যুঞ্জয়
গড়েছিলো ওই সুঠাম প্রলয় ?

অতল সাগরে, অগম শূন্যে
জ্বলেছিলো কি ও-আঁখির বহ্নি ?
সে-আগুন নিতে ভ'রে দুই মুঠি
ভর করেছে সে কোন পাখা দুটি ?

কত বড়ো কাঁধ, কোন সে যন্ত্রী
গড়েছিলো তোর হৃদয়তন্ত্রী ?
জাগিয়ে পাঁজরে আদিতম ধ্বনি
কোন বাহুবল, পায়ের বাঁধুনি,

কিসের হাতুড়ি, কেমন শেকল,
মগজ-গলানো কোন দাবানল,
কিসের নেহাই, সাঁড়াশির চাপ
গ'ড়েছিলো ওই দারুণ প্রতাপ ?

দীর্ঘ বর্শা তারাদের হাতে
খ'সে গেলে, নীল অশ্রুপ্রপাতে
ধুয়ে গেলে, গড়া হ'য়ে গেলে শেষ
সে কি হেসেছিলো ? তারই রচা মেষ

বাঘ, বাঘ, তুমি রাঙা অঙ্গার,
জ্বলো অরণ্যে ঘন তমসার।
কার হাত চোখ মৃত্যুঞ্জয়
গড়েছিলো ওই সুঠাম প্রলয় ?

২. দিব্য-প্রতিমা

দুঃখ যখন আঘাত করে, সবাই খুঁজে ফেরে
মৈত্রী দয়া করুণা আর ভালোবাসা ;
আনন্দময় নিত্যগুণকে জানায় বারে-বারে
ধরণী তার নিবেদনের নম্র ভাষা।

কারণ দয়া করুণা আর মৈত্রী ভালোবাসাই
পরম প্রভু, পরম পিতা, প্রিয়তম।
আবার দয়া ভালোবাসা মৈত্রী করুণাতেই
রচিত তাঁর সত্য মানুষ নিরুপম।

কে করুণা ? হৃদয়ে তার হৃদয় মানুষেরই,
দয়ার মুখে এই মানুষের প্রতিকৃতি,
পুণ্য নরদেহেই ছাখো ভালোবাসার দেহ,
নরদেহের আঁচল জড়ায় মৈত্রী প্রীতি।

তাই বলা যায়, দুঃখ যখন আঘাত করে বুকে
ভক্তিভরে যে যেখানে নোয়ায় মাথা,
তখন দয়া করুণা আর মৈত্রী ভালোবাসাই
মানুষকে বন্দনা করে, সে-ই বিধাতা।

হোক সে ম্লেচ্ছ, হোক ইহুদী, হোক তুরাণী, তবু
বরণ করো নরদেহের অধীশ্বরে ;
যেথায় দয়া করুণা আর মৈত্রী ভালোবাসা,
আছেন তিনি তাঁদের সঙ্গে সবার ঘরে ॥

পু র নো ক বি তা

১. গোলাবাড়ির গান

গোলা উজাড়, দিন মহাজনের ঘরে :
আমরা যে জাতগেরস্ত, উঠোন খা-খা করে—
এ আর চেয়ে দেখতে পারিনে।
আমরা যে জাতগেরস্ত, পুজোবাড়ি খা-খা করে—
এ আর চেয়ে দেখতে পারিনে।

আজো আশ্বিন প্রাচীন অভ্যাস মতো রোদ পাঠায়
নরম ভর্ৎসনার মতো কড়া,
পাঁচিলে শবীর ঢাকে অকারণ ফুলে ভরা
দুঃখিনী স্থলকমলের গাছটা।
ইটখসা বুড়ি ইঁদারায়
নিয়মিত জল নিতে দাঁড়ায়
টিপ-পরা চুল-বাঁধা বিকেল পাঁচটা।

অথচ গোলা উজাড, রাত মহাজনের ঘরে :
বিনি আলপনায় উঠোন খা-খা করে—
এ আর চেয়ে দেখতে পারিনে।
আমরা যে জাতগেরস্ত, মাঠবন খা-খা করে—
এ আর চেয়ে দেখতে পারিনে।

২. পদ্মাপারের ডায়েরী থেকে

সন্ধ্যা নামলো বিরলবসত নদীর চরে, এঁকে-বেঁকে
ধোঁয়া উঠলো কাছে-দূরের কুটির থেকে,
এবং ক্রমে আকাশপ্রমাণ শাদা মেঘে
রাত ছড়ালো ঘুমের আলো।

শিশুসবুজ ধানের চারা
হাওয়ায় তাদের আঙুল বাড়ায়,
অন্ধকারেও খেলতে ডাকে,
আমাকে নয়, অন্য কাকে !

দেখা যায় না, আকাশে কে গ্রহতারার প্রদীপ জ্বালে।
আপনি জ্বলে, না কেউ জ্বালায় ?
এখনি রাত গভীর হলো !
এইতো ডুবলো দীপ্ত রবির সোনার থালা !

কখন দেখি প্রশান্ত এক আলোর ধারা
ঝরছে সারা আকাশ থেকে
কৃষাণীদের দাওয়ার 'পরে,
বিশাল সবুজ নদীর চড়ায়
আকাশ থেকে আলো ঝরে,
আলো ঝরায় বোবা রাতের
অন্ধ দুটি চোখের চাওয়ায়
দৈব হাওয়ায়।

এবং কেমন ভয় পায় না খেয়াঘাটের ছোট্ট কুটির একা-একা,
অন্ধকারে নিজের লোককে কী নিশ্চিন্তে আলো দেখায় !

৩. ময়ূরভঞ্জের পথে

তারপর হঠাৎ দূরে নীলপাহাড়ের ছায়া দেখে
হুইসিল দিয়ে ট্রেন থামলো : স্টেশন নয়, প্রান্তর।
কেউ উঠলো না, বরং নামলো
দুটি মিস্ত্রী, তাদের ঝোলা।

অদূরে মহুয়াপাড়ায়
একসার সাঁওতাল দাঁড়ায়,
পাতাছাওয়া সব কুটিরের দরজা খোলা।
দেখলাম না আছে কি নেই ধানের গোলা।

কপালে টান ক'রে বাঁধা চুল
ভুঁই ফুঁড়ে কখন উঠলো আশ্চর্য একঝাঁক কালো ফুল।
নিরাপদ ফাঁক রেখে এঁকেবেঁকে একটু দূরে থামে
ময়ূরভঞ্জের এক নাম-না-জানা গ্রামে।
জানা হয় না, কেন তন্বী দুইসখী উসখুস ক'রে হাসে
জন্মজন্মান্তরের চৈত্রমাসে।

এঞ্জিনের তন্দ্রা ভেঙে একসময় দুলে ওঠে গাড়ি :
আর একটু দাঁড়ালে হ'তো, কিছুই ছিলো না তাড়াতাড়ি

৪. বালেশ্বরের সমুদ্রতীর : ১৯৪২

এইখানে নীল সাগরতীরে হয়তো ছিলো দুর্গপ্রাকার
শত জোয়ার ঢেউয়ের ফেনার প্রণাম রাখার।
হয়তো ছিলো সেনাদলের আসা যাওয়া,
আছড়ে-পড়া দেশবিদেশের পালের হাওয়া।
এখন শুধুই ঝাউয়ের সারি,
ঝিনুক-ঢাকা বালিয়াড়ি,—
যেখানে আজ দিনের শেষে
শব্দ আর স্তব্ধ মেশে,
গরিব মেয়ে খুঁজে বেড়ায় শাঁখের কড়ি,
হাঁটুজলে ঢেউয়েরা দেয় গড়াগড়ি।

আলো-সকাল, কালো-বিকেল বেয়াল্লিশের বালেশ্বরে
ময়লা জলের জোয়ার আসে, ভাঁটা পড়ে॥

৫. আহা লাল ফুল

ফুলেরা হাওয়ায় টলে
ফুলেরা উতলা হয় ভয়ে।
গন্ধহারা বাসি গোলাপের
এলানো পাপড়িগুলি, মলিন পাপড়িগুলি
ধুলোয় ছড়ায়।
আহা ফুল, আহা লাল ফুল।

অপগত আকাশের হিরণ্ময় থালা।
দিনের দুর্জয় সূর্য পশ্চিমের বনে
কুশলী ব্যাধের পাতা জালে ধরা পড়ে।
আর্তনাদ থামে পাখিদের।
তরল শিশুর কণ্ঠ উড়ে যায় নক্ষত্রের ভিড়ে,
এবং নক্ষত্র থেকে চরাচরে ঝরে মৃত্যুভয়।

আহা ফুল, আহা লাল ফুল॥

তাতারসমুদ্র-ঘেরা

(অম্লানের জন্য)

ছড়ানো প্রাণের মেলা, জীবনের মুগ্ধ আনাগোনা
এ-অলীক আনন্দের শত্রুতা সাধতে পারবো না।

কে মন্দ মানুষ, কে বা শাদা কালো—
তাকাও, বিষণ্ণ চোখে আলো জ্বালো,
ছাখো প্রাণরঙ্গভূমি, চিনে নাও আত্মপরিজন,
ভাতারসমুদ্র-ঘেরা জননী বসুধা একাকিনী,
উদাসিনী ধুলোর প্রাঙ্গণ।
বিদেশী মাল্লার নৌকো ঘাটে-ঘাটে, দেশান্তরী জাহাজের ভিড়।
মরুতে উদ্যান খুঁজে ক্যারাভান ফেলেছে শিবির।
বাজারে বিচিত্র পণ্য, বকমারি মালা বালা কাঠের চিরুনি,
মালসা বা মাটির হাঁড়ি, সাজানো সঙিন আখ—
কিসের ডুগডুগি শুনি ?

চলো মেলায়, চলো মেলায়,
বেলা এলায় মাঠে বনে,
রাঙা ধুলো তুলি বুলোয় প্রাণেমনে।

অন্য কোন অপার্থিব খুঁজবে উর্ধ্বে নীলিমার শূন্যে ?
সবই কি এখানে নেই, আবর্তিত নরনারীর
উদ্গত অশ্রুতে কেনা পুণ্যে ?
পাণ্ডাকে অচল সিকি সঁপে উঠবে কোন স্বর্গের সিঁড়ি ?
জুয়াড়ীর পাপচক্রে সর্বস্ব খুইয়ে কেন বাড়ি ফিরি ?
উন্মনা শীতের রোদ, দূর থেকে ববং ছাখো, ভাঙা দেউলের দরজায়।
গলাগলি গাঁয়ের মেয়ে দুটি ঘর যায়।
এর মধ্যে তুমি আমি সে
আরো অগণ্য অন্য, চিনিনে যাদের, পাইনে দিশে,
মন্দ কি মাঝারি, কি-জানি-কেমন, শাদা কালো বাদামী :
অশেষের লব্ধ বিস্ময়,
বার-বার মনে হয়—
হা, কোথায় আমি !
কেন এলাম ? কিসের টানে আসা ?
কার কী রেস্ত ? কার খোঁজে

খাপছাড়া আড়াল লোকটা ঐ-পথিক
কেন চোখ বোজে?
কোন পাপে ঐ-বিকলাঙ্গ
ব্যস্ত ভিড় এড়িয়ে হঠাৎ তার যাত্রা করলো সাঙ্গ?
জানি না, জানবো না। চলো বরং একদান নাগরদোলায় ছুলি।
অন্ধ ভিখিরির মেয়ে, ভরলো না হয়তো তার
দিনান্তের স্বল্প আশার ঝুলি।
ডুম-ডুম নাগারা পিটছে দু-আনা টিকিটের সার্কাসতাঁবু।
পানউলীর সঙ্গে নিভৃত ঠাট্টায় রত পামশুপরা বাবু।
দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে দেখি, শুকোয় না পটুয়ার তুলি।
উদাসীর ধুনি জ্বলছে, সুমুখে সিঁদুর লেখা
বিমর্ষ মৃতের তিন খুলি!
এরই মধ্যে পকেট কাটছে কেউ,—মূলধন বাড়ায়—
সুখের জংশনে যাবে দ্রুত ট্রেনে, কম ভাড়ায়!

অনিঃশেষ শেষ দেখা, চোখ ফেরে না, এমন আশ্চর্য
মর্ত্যজীবনের পারম্পর্য।
উত্তমের নিকোনো আঙিনা,
অধমের নোংরা গন্ধ গলি—
খোলা চোখের সময় পাই যেন দেখতে সকলই।
মা-মরা শিশুর শুকনো ঠোঁটে কান্নায় ভেজা শস্তা বাঁশি
শুনতে-শুনতে শেষ যেন ঘাটে আসি।
কিংবা যাই পাহাড়ী পাকদণ্ডী বেয়ে দূরে
কুয়াশায় মিশতে, প্রাণরঙ্গভূমির মেলা ঘুরে।
অথবা নামি পাতালের সিঁড়ি বেয়ে তলায়
প্রত্যক্ষ করতে আঁধারের বিখ্যাত কারুকলায়।

এখানে তখনো চলবে দেশদেশান্তরী আনাগোনা।
সাধ নেই, সাধ্য নেই, এ-ক্ষণিক আনন্দের
শত্রুতা সাধতে পারবো না॥

কত কিছু দৈবে ঘটে

কত কিছু দৈবে ঘটে ধরণীর পদপ্রান্তে এসে।
কুটিল নদীর স্রোত পাড়ি-ধসা দুঃস্বপ্নের শেষে
আশার সমুদ্রে মেশে ; জনতার মেলা
ধাবমান প্রহরের ডঙ্কা শুনে ভেঙে দেয় খেলা ;
সোনার বিকেল পড়ে বসন্তের পাতায় পল্লবে :
সব হবে, মন বলে, আবার আবার সব হবে।

দ্রুত ট্রেন দু'দণ্ডের শ্বাস ফেলে স্টেশনে দাঁড়ায় :
জানালায় হাত নেড়ে কে কোথায় দূরে চ'লে যায়,
পিছু ফিরে তাকায় না, যদি চোখ ঘোব হ'য়ে আসে।
দিনান্ত ফেরায় রঙ বীরভূমেব আকাশে-আকাশে।

কত কিছু দৈবে ঘটে। খোলা মাঠ, ছনে-ছাওয়া বাড়ি,
রেললাইনের পাশে চীনেচিত্র শিমূলের সারি,
ডোবাতে পল্লীর ছায়া, আসন্ন তিমিরে চেয়ে থাকা
জ্যোতিষ্কেব দীপ্ত চোখ চৈতন্যে নিমেষে পড়ে আঁকা।

যদি ফিরে আসা যেতো, ধরণীতে কত দৈব ঘটে !
সমুদ্র-মেখলা মাটি পর্বতে কান্তারে সমতটে
দূরে দূরান্তরে জাগে কত মৃত্যু কত ভালোবাসা :
বুক ভেঙে যায়
আনন্দে বিষাদে বেদনায়
কী মন্ত্র শেখায়, ত্যাখো, আনন্দিত শালবীথি,
বলে, 'আশা রাখো
জীবনের যত অসম্ভবে।'

সব হবে, মন বলে, আবার আবার সব হবে।

সম্ভাষণ

ওরে ভীরু, ওরে পরম অবিশ্বাসী,
এখনো কি তোর জাগলো না প্রত্যয় ?
হৃদয় তোমার এখনো দিলো না সাড়া ?
ছাখোনি কি তুমি—রাত্রি রয় না খাড়া
প্রত্যূষে কালো পাহাড়ের মতো ? যেই
আকাশ পেয়েছে আলোর সুতোর খেই,
দশদিক যেই গেয়েছে দিনের জয়,
সংশয় দুঃস্বপ্নেব মতো বাসি,
তমসা পোহায় : পোহায় না তোর ভয় ?
ওরে ভীরু, ওরে পরম অবিশ্বাসী !

জীবন কি তোকে শেখায়নি কোনো গান ?
মৃত্যু আনেনি কোনো অভাব্য ক্ষেম ?
ঘাতক সময় কুঠাবে দেয় কি শান
দিনরাত শুধু তোমাকেই ভেবে ? প্রেম
কোনো অসময়ে, প্রভূত ক্লেশের শেষে,
তোমার তপ্ত কপালে রাখেনি হাত ?
বিকেলে যখন সন্ধ্যার ছায়া মেশে,
সব কালো চোখে কাজল পরায় রাত,
তৃতীয়ার চাঁদ উঠে আসে নীলিমায়,
নীরবে ঝবায় প্রভু বুদ্ধের হাসি :
বিশ্ব তখনো তোমার অন্তরায় ?
ওরে ভীরু, ওরে পরম অবিশ্বাসী !

বিদিশার ইনি আর উনি

উৎসর্গ

বিদিশা

সুচরিতা



মেমসায়েবের নাম হ'য়েছে—রাই।
আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে
আমরা শুনতে চাই—
কেমন ভাষায় লিখলে ছড়া তার
আর হবে না মন জোগানো ভার।
কেমন ভাষায় কাঁদেন তিনি,
        কেমন ভাষায় হাসেন,
মা-বাবাকে থেকে-থেকে
        ভালো-মন্দ বাসেন?
খাই-খাইটা বেরোয় কাদের ভাষায়?
কান পেতে রই গোপন এ-সব
        গল্প শোনার আশায়।
ঘুমের খাটে স্বপ্ন দেখেন
        ইংরেজি না বাংলায়?
হিকোরি ড্রাইভ বাঁশবাগানের
        খাসবাগানের মাথায় কদাচিৎ
চাঁদ দেখে কি হাতছানি দেন—'আয়'?
চোখ ভরা কি বাংলাদেশের আলো?
কোঁকড়া চুলের বাহার কি জমকালো?

ঝিলিক দেওয়া মিষ্টি খুদে
        দাঁতগুলো কি খানিক
মনে পড়ায় স্বপ্নে-পাওয়া
        আর এক দেশের মাণিক ?
সত্যি, কিছুই হয় না জেনে।
        মন করেছি তাই—
পড়ুন বা না-পড়ুন তিনি,
যা-ইচ্ছে তার করুন তিনি,
একমুঠো এই বাংলা ছড়ার
        এক তৃতীয় মালিক হ'লেন রাই।
থাকগে এটিকেট :
নেয় যেন সে শুকনো খোয়াই থেকে
আদর ক'রে পাঠানো এই ভেট্॥

কেন

ছোপানো চুল সোনার জলে
পুতুলটা কী কথা বলে !
ডেকে জানায় ক্ষণে-ক্ষণে—
কে থাকে শান্-তিকেতনে !
চকচকে চোখ তুলে হাসে
ভালোবাসতেই ভালোবাসে।
ছড়া শোনায়, ছড়া শোনে,
নিজের হাতের আঙুল গোনে।
দুধ খেয়ে নেয় এক চুমুকে,
আঁকড়ে থাকে মায়ের বুকে,
চাপা গলায় ডাকে—'মাগো,
ঘুম যেয়ো না, এট্টু জাগো,
গল্পো বলো'। আর কিছু সে চায় না।
শুনতে চায় সে মায়ের কাছে—
সব পাখিদের বেবি আছে,
সে কেন রোজ সেই বেবিদের
আদর করতে পায় না॥

বড়ো হওয়া

শুনছি নাকি বড়ো হচ্ছো তুমি ?
এটা বুঝি বাড়ন্ত দুষ্টুমি ?
পাঁচে পড়লেও নও কি তুমি ছোটো ?
কখন ভোরে ঘুমোতে যাও,
রাত্রিবেলা কখন জেগে ওঠো ?
খাও কি উঠেই আধসেদ্ধ ডিম ?

নাওয়া[illegible]রে গালে লাগাও ক্রিম ?
না-লেখা বই নিজের মনে পড়ো ?
তাই কি তুমি আজ সকালে জেগেই
হঠাৎ হ'লে বড়ো ?

হায় দেমাকী, আমরা কতোবার
তোমার সাধের পাঁচ হ'য়েছি পার।
হাড়মিথ্যুক ক্যালেণ্ডারের পাতা
হিশেব যা দেয়—যা-তা—।
গুণেগেঁথে যে যাই বলুক
আমাদের ঐ পাঁচে
প্রাণভোমরার বয়েস আটকে আছে।
ফিরে-ফিরে আমরা সবাই তাই
পাঁচটা করি পুরো।
ইতি তোমার বছর পাঁচেকের
ছোট্টো কোনো বাহাত্তুরে বুড়ো॥

ঘুমের গান

করছো কী ছুটি নিয়ে সাঁওতালী ঝুমকায় ?
হোমরাও চোমরাও,
দল বেঁধে তোমরাও
খুঁজছো কি ঘুমকে ?
পাওনি তো ? আমরাও খুঁজছি তো, পাইনি।
জাল পেতে ধরেনি তো ওপাড়ার ডাইনি ?
এসো তবু প্রাণ ভ'রে এসো তারই গান গাই,
পথে-পথে নাম ধ'রে ডেকে যাই :

'চোখ ভ'রে নেমে আয়,
আয় ঘুম, ঘুমরে।
বুক ভ'রে নেমে আয়,
আয় দেহ দুমড়ে।
এলে তুই সুখী হবে
দুখিনীর সন্তান,
সুখী হবে মাঠে-মাঠে
রুয়ে রাখা সোনা ধান।
হয়তো বা ভাঙবে না
হেলে-পড়া সংসার,
হয়তো অবশ হবে
দুনিয়ার সাপ-বাঘ,
ক্ষণতরে চরাচরে
হয়তো বা মুছে যাবে
যত ভয়, বিদ্বেষ ;' যত রাগ
কিছু কান্না
তোরই গুণে হয়তো বা
হবে পান্না।'

তাই বলি, 'আয় ঘুম
ফিরে আয়, নীড়ে আয় :
কোথায় উড়িস তুই
এ-তারায় সে-তারায় ?'

আগুন

সব আগুন কি একই আগুন,
অন্ধকারে আলো ?
সময় থাকতে এই কথাটা
ভেবে রাখাই ভালো।
কোন আগুনে সেঁকে এবং
কোন আগুনে পোড়ে,
কোন আগুনের ধোঁয়া গিলে
শূন্যে বেলুন ওড়ে ?
হাড়-কাঁপানো শীতকে ঠেকায়
কোন আগুনের তাপে ?
খাণ্ডববন ছাই ক'রেছে
কোন আগুনের শাপে ?
বুকের আগুন, চোখের আগুন,
একই জিনিশ কিনা ?
অন্ধকারে জোনাক কেন
জ্বলে আগুন বিনা ?
কেমন আগুন বোমার বেশে
নামে আকাশ থেকে ?
তাই বলেছেন রবীন্দ্রনাথ
কোন আগুনকে ডেকে ?
কখনো কি স্বর্গে ছিলো ?
ছিলো সূর্যে তারায় ?
রাত্রিশেষে সে-ই কি এসে
ভোরের শিরে দাঁড়ায় ?
কখন জ্বলে ভালোবাসায়,
কখন জ্বলে রাগে ?
কোন আগুনকে নেভাতে হয়
যখন ঘরে লাগে ?

আশ্বিন যেন

আশ্বিন যেন ছুটির দেশের রানার,
কাঁধে ব'য়ে আনে ঝোলাখানি তার
হাল্কা খবর আনার।
আর ব'য়ে আনে নীলপরীদের ওড়না,
রোদের মিষ্টি,
আর এনে দেয় কাশের বনের
শ্বেতহাস্যের বৃষ্টি।
ঝুম ঝুম বাজে ঘুন্টির ধ্বনি
চলা বেধে যায় ঘাসে।
খিলখিল ক'রে নীলাকাশ জুড়ে
প্রাণ খুলে কারা হাসে।

হাতে-খড়ি

অস্ট্রেলিয়ায় অধরবাবুর
সাতমহলা বাড়ি।
আর্য হাঁকান আফ্রিকাতে
রোল্‌সরয়স্‌ গাড়ি।
ইথাকাতে জজিয়তি
সাধছে হ্রস্বই-কে।
দীর্ঘঈ সেন জাহাজ ভাসান
ঈশান কোণের দিকে।
কিনতে পেরে হ্রস্বউ-দের
উটের বহর শস্তায়
দীর্ঘঊ রায় রপ্তানি দেয়
ঊর্ণা বস্তা-বস্তা।

রাজর্ষি শ্রী কারফর্মা
জার্মানদের ঋণে
ভেটকি মাছের শুঁটকি ভরা
আড়ত বসান চীনে।
অ আ ক খ রপ্ত ক'বেই
এ ধ'বেছেন বাই—
পাতাল থেকে ঐরাবতের
ফসিল তোলা চাই।
ওমরবাবুর ওমান ছেড়ে
রোমান হওয়াই ঠিক।
ঐ মিস্তির গিনিস-বুকের
সেরা ঔদরিক॥

প্রশ্ন

জ্বাললে জ্বলে যে-সব আলো
মানুষ জ্বালায়,
চলতে পারে যে-কলকজা
মানুষ চালায়।
জল তুলে জল ভ'বতে পারি,
ঢালতে পারি।
খনি খুঁড়ে তেল বেবোলে
চলবে গাড়ি।
নীলসাগরের ওপার ছিলো,
তাই জাহাজে
এ-বন্দরে সে-বন্দরে
শিঙে বাজে।

ভয়ে-ভয়ে এমন কথাও
যায় তো বলা—
সুর সাধোগে, থাকে যদি
গানের গলা ?
ইচ্ছে হ'লেই কাঁদতে পারো,
হাসতে পারো :
তবে কেন ভালোটা না-
বাসতে পারো ?

বোধোদয়

খোকনমোহন ছিঁড়েছিলেন বোধোদয়ের পাতা :
তা নিয়ে কী কাণ্ড হ'লো,—যা—তা— ।
রদ্দি কাগজ, তেমনি ছাপা, ছিঁড়তে হয় না টেনে।
একখানা যায়, ফিরে সবাই আর একখানা কেনে।
কিন্তু খোকন জন্মেছিলেন এই এ-কালের বঙ্গে,
মন্দ কপাল এনেছিলেন সঙ্গে।
মা রেগে কন, 'খাবে না আজ', বাপ বলেন, 'এই
শুরুর থেকেই বোঝা গেলো
কপালে এঁর বিদ্যে লেখা নেই।
বিদ্যেসাগর লেখেন যে-বই সে-বই ছেঁড়ো তুমি !
এতটা মুখ্যুমি !
ব'লে দিচ্ছি, বিদ্যেধর এ-ছেলে
আজ ছিঁড়ছেন বইয়ের পাতা, কাল কাটবেন গলা,
যাবেন জেলে।'

রায় দিয়ে বাপ অপিস গেলেন,

রাস্তা দিয়ে দাপড়ে গেলো
দুতিন গাড়ি পুলিশ
খোকনমোহন আছিস যারা
জানলা কপাট সাবধানেতে খুলিস।

বিশেষত

সবাই বলেন—ছেলেবেলায়
অনাদরে অবহেলায়
শরীবটাকে জখম কবা অসঙ্গত।
বলতে ভোলেন তাবি সঙ্গে,—
বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে,—
স্বপ্নগুলোও সাধতে হবে মনের মতো,
ভাসতে হবে অবিবেচক
অসম্ভবেব খুদে ভেলায়,
বিশেষত ছেলেবেলায॥

ইন্দ্রাণীর জন্য ছড়া

এই যে দেখছো কাক, কিংবা কবুতরের ঝাঁক,
পায়ে হলুদ, ঠোঁটে হলুদ শালিখ,
দুপুরবেলায় রোদটা যখন ঝাঁ ঝাঁ,
আজব শহর সোনার আলোয় মাজা,
কয়েকটা চিল আকাশখানার মালিক,—
দেখে তোমার মন বলে কি—'থাক,

ত্রৈরাশিক কি দশমিকের আঁক,
        ইতিহাসের পড়াটা আজ থাকগে ?
অনেক জেনো আছেন তোমার দলে
একলা যারা এসব কথা বলে,
        ব্যারিস্টরি নেইকো যাদের ভাগ্যে !
আগাগোড়া জীবনটাকে লড়াই
ভাবেন যারা তারাই করুন বড়াই,
        তুলুন তারা আকাশ-ছেঁড়া বাড়ি।
কাক বা শালিখ কে হয় ব্যারিস্টার ?
চড়ুই কি চায় উঁচু বাড়ির সার ?
        ইচ্ছে-সুখেই জমায় তারা পাড়ি ;
সওয়ার সেজে হাওয়ার ঘোড়ায় চ'ড়ে
এদেশ বিদেশ যেমন খুশি ঘোরে
        ব্যস্ত যখন আপিসে যান বাবু।
শান্ত দুপুর, শুনো পড়ার ফাঁকে—
আড়াল থেকে পোখপাখালি ডাকে,
        আকাশ বিছায় তেপান্তরের তাঁবু।

একটু তখন ভূগোল ফাঁকি দিলে
কানের সোনায় ছোঁ দেবে না চিলে ॥

বড়ো খবর

সূর্য থাকেন দিনের বেলা, রাত্রে থাকেন চাঁদ,
আকাশ ভরে গ্রহতারায়,—এই বড়ো সংবাদ
কেউ পড়ে না ভোরের বেলা, কেউ পড়ে না সাঁঝে।
অষ্টপ্রহর থেকে-থেকেই ভঙ্গ দিয়ে কাজে
তাইতো সবাই চেঁচায়, বলে—'হায় কী সর্বনাশ,

তিমি-র মতো তিমির এবার সবটা করবে গ্রাস,
বাঘ বেরোবে পথে ঘাটে, সাপ ঢুকবে ঘরে,
বিষাক্ত গ্যাস করবে বিরাজ হাওয়ার স্তরে-স্তরে।
মেঘ দেবে না জল, তাইতো মাঠ দেবে না ধান,
কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হবে না আর গান।
হায় কী সর্বনাশ,
শেয়াল-শকুন কেড়ে খাবে খোকার মুখের গ্রাস।'

বলতে-বলতে সূর্য ওঠেন, বলতে-বলতে চাঁদ
আকাশ কোণে দাঁড়ান এসে, ভাঙে আলোব বাঁধ।
আবার মেঘে বৃষ্টি ঝরে, ফসল ফলে মাঠে :
ধুলোর শিশু দুচোখ মুছে টলতে-টলতে হাঁটে॥

পাণ্ডুয়া

তুমি কি কখনো বন দিয়ে ঘেরা
পাণ্ডুয়া দিয়ে গেছো,
তালবনে ঘেরা, বাঁশবনে ঘেরা
নিরিবিলি পাণ্ডুয়া ?
মেয়েরা যেখানে পৌষের রোদে
শস্য ঝাড়াই করে,
অশথ গাছের শাখায় যখন
উড়ে বসে কাকাতুয়া ?
তাহ'লে বোধ হয় দেখেছো সে-বনে
প্রাচীন মিনার উঁচু,
অট্টালিকার ভাঙা ভিত ঢাকা
কঠিন বন্ধ্যা ভূমি

ছায়া-ক'রে-থাকা অতিকায় এক
দানব তেঁতুল শাখা,
লোহার কপাট মিনারের গায়ে
তাহ'লে দেখেছো তুমি।
সন্ধ্যার সিঁড়ি ঘুরে-ঘুরে তুমি
মিনারে কি উঠেছিলে ?
তাহ'লে বোধ হয় সব চেয়ে উঁচু
জীর্ণ খিলান থেকে
ঝাপসা আলোয় চেয়ে দেখেছিলে
পাণ্ডুর পাণ্ডুয়া,
বন চিরে যার রাঙা ধুলো ঢাকা
পথ গেছে এঁকেবেঁকে।
ক্ষয় হ'য়ে আসা সিঁড়িটি যেখানে
শেষ ধাপে গেছে থেমে,
দেখোনি সেখানে দাগ-ধরা সেই
শাদা দেয়ালের ঘরে
কারা লিখে গেছে কাঠকয়লায়
নামধাম নিজেদের
কাঁপা হাতে, বুঝি ভয়-ধরা মনে,
এলোমেলো অক্ষরে ?
নিচে নির্জনে কৃপণ আলোয়
যুগল কৃষানী মেয়ে
গালে গাল রেখে হেসে উঠেছিলো,
পাওনি তাদের দেখা ?
এতদিনে তারা কোন পাড়াগাঁয়
যুবক-স্বামীর ঘরে !
কিন্তু তুমি কি দেখোনি আমার
ছোটো ক'রে নাম লেখা ?

লাল মেঘ

পাহাড়ের জটা থেকে যত জল ঝরে
নদী নিয়ে রেখে আসে সাগরের ঘরে।
সেই জলে রঙ লাগে, সেই রঙে তুলি
ডুবিয়ে আকাশে আঁকা লাল মেঘগুলি।
সে-ছবি কেনে না কেউ, কিবা তার দাম!
কে ভরাবে তাই দিয়ে দামী এ্যালবাম?
টাঙাবে না শহরের কোনো গ্যালারিতে,
টাঙালেও কাটবে না কেউ লাল ফিতে।
শিল্পীর আঁকা নয়,
রঙগুলো পাকা নয়,
তবু মন খুশি করে কারো।
নাম নেই, দাম নেই,
দেখেশুনে আকাশেই
হেলাভরে রেখে দিতে পারো।

গোপন আশা

সূর্য, তোমায় ভালোবাসা সহজ তো নয়,
আমায় যেন চিনতে পারো সকল সময়।
রোজ সকালে খেয়ো আমায় ছোট্টো চুমো,
সন্ধ্যা হ'লে যেয়ো ব'লে—'এবার ঘুমো'।
কপাল আমার পুড়বে যখন জ্বরের তাপে,
দিনরাত্তির বন্দী র'বো ঘুমের খাপে,
জানবো না যে কখন সকাল, কখন দুপুর,
আঁধার হ'লেও শুনবো না আর ঝিঁঝিঁর নূপুর,

দেখবো না আর চোখ তাকালেই রোদের সোনা,
আলোর শাড়ি ছায়ায় ছাপা, রূপোয় বোনা,
ব্যথায় তখন দু-চোখ যদি বুজেও থাকি,
পাঠিয়ে দিয়ো ছোট্টো কোনো দোয়েল পাখি—
আমার গোপন জানালাতে ডালের ফাঁকে
গলা খুলে দোয়েল যেন আমায় ডাকে।
সে-ডাক শুনে জানবো আমি—তবু আছি,
সখা, তোমার কাছাকাছি।

প্রথম যেদিন সারবে শরীর, ভোরে উঠে
আবার তোমায় দেখার আশায় যাবো ছুটে।
নীচু গাছের পাতার ফাঁকে দিয়ো দেখা
শুধু আমায় সেই নিরালায় একা-একা।
ছুঁয়ো তোমার আঙুল দিয়ে মাথার চুলে,
একটুখানি আদর কোরো কানের দুলে।

কিন্তু যদি হারিয়ে যাই কোথাও দূরে,
সাত সাগরের পারে-পারে বেড়াই ঘুরে,
অন্য দেশের শহর গাঁয়ের ভিন্ন নদী,
অন্য পাহাড়, ভাগ্য আমার দেখায় যদি,
অনেক যখন বয়েস হবে, দিনের শেষে
আবার যদি ফিরি ছেলেবেলার দেশে,
বিদায় নিতে আবার যদি ফিরে আসি,
চিনো বন্ধু, বলতে দিয়ো—'ভালোবাসি'।

রূপকথা

(কলকাতার রাস্তায় যখন গ্যাস জ্বলতো)

রোজ সন্ধ্যায় আলো দিয়ে যায় গ্যাস-জ্বালা লোক,
আসে বারোমাস, যত জল হোক, যত ঝড় হোক,
ঘাড় ক'রে হেঁট, বড়ো তড়বড়, কাঁধে ফেলে মই।
আমি বিকেলের আবছা আলোয় জানালায় রই
চটপট সেরে বিকেলের স্নান, বেঁধে নিয়ে চুল :
গ্যাস-জ্বালা তার বুঝি একদিনো হ'তে নেই ভুল।
মই পেতে উঠে কী বলে লোকটা গ্যাসেদের কানে,
ফিক ক'রে হেসে আলোগুলো ঠিক বোঝে তাব মানে।
কুঁজো পিঠ তার, ছেঁড়া জামা গায়, কে জানে কী নাম।
কাশী থেকে দূরে হয়তো তাদের পিসীদের গ্রাম।
তারও কি ছিলো না বুড়ী দাই-মা যে রূপকথা কয়?
ভাবি ব'সে-ব'সে, বাজে ঘণ্টায় সাত আট নয়।
বড়ো ঘুম পায়, কচলাই চোখ, তবু দেখি চেয়ে—
এ-গলির মোড়ে একলা দাঁড়িয়ে পরীদের মেয়ে।
তার ঘুম নেই, অন্ধকারেও মেলে থাকে চোখ,
হয়তো যেমন শিখিয়েছে তাকে গ্যাস-জ্বালা লোক।
সে কি আমাকেও শেখাবে না, যদি দিতে চাই ভেট
জন্মদিনের সব বই আর সব চকোলেট?

সুখী নামের মেয়েটা

দেশের নাম বস্তার।
সব জিনিশই আক্রা, শুধু
শিশুর জীবন শস্তার।

বাঁজা চাষের মাঠে
মেয়েপুরুষ সকালসন্ধ্যা খাটে :
দোষের মধ্যে হৃদয়গুলো দস্তার।
কারণ, জানে সবাই,
ওদেরই কার দুধের শিশু
গাঁয়ের পুরুত করবে একদিন জবাই
না-হয় যদি মনের মতন বর্ষা,
মাঠে জলের একটি মাত্র ভরসা।
তখন যদি দেবতা বলি চান
রাখতেই হয় তেনার বড়ো মান।
এবার পালা কার ?
ভাবলে চোখে নিপাট অন্ধকার।

কেউ জানে না মায়ের নাম,
মেয়ের নাম সুখী !
রোদ্দুরে আহ্লাদী এক
বুনো সূর্যমুখী।
কোমর-ঢাকা খাটো শাড়ি,
বনে কুড়োয় কাঠ।
সুখী নামের এই অভাগীর
একটাই ছিলো ঘাট :
বস্তারের মেয়ে হ'য়েও
বয়েসটা তার বেড়ে
ছুঁয়েছিলো বে-আক্কেলে আট !

মহুয়া ফল পিষে মায়ের
তেল জোগাতো রান্নার,
এখন জোগায় নোনাপানি
চোখ-ছাপানো কান্নার।
আট বছরের দিব্যি মেয়ে, কাজেই
দেবতা নিলেন তাকে :

মোড়ল পুরুত কান পেতে রয়—
এবার বুঝি আকাশে মেঘ ডাকে।

বুক ফেটে যায় মায়ের শোকে
কিন্তু বলো, কসুর ছিলো কার ?
কোন অপদেব্‌তার ?
কেন আমার সুখীর শোকে
গর্জায় না গাঁয়ের লোকে,
জ্বালায় না সংসার ?
মনের কুলুপ, মুখের কুলুপ
কেন
কেন
কেন
খোলে না বস্তার ?

সত্যি চাওয়া

তোরা সত্যি যদি চাস
আরো সবুজ হবে ঘাস
আরো মিষ্টি হবে জল
আরো স্বাদের হবে ফল
তোরা সত্যি চাইলে পরে
আকাশ বাতাস গানে ভরে॥

পরবর্তী কবিতা

কলকাতা

মন্দ ছিলো ?—গাঙের ধারে কাপাস খেতে কাপাস,
জলে বিরাট কুমির, ডাঙায় বাঘ,
বাঁশের বনে ভুরুশেয়ালি, কাশের বনে সারস,
ঘাসের বনে তর্জে ওঠা গোখরো সাপের রাগ ?
মন্দ ছিলো ?—হুতুমথুমো, তাগাতাবিজ, তিলক ফোঁটা ?
মধ্যে-মধ্যে গুটিওঠা, মধ্যে-মধ্যে ওলাওঠা ?

বেশ তো ছিলো। কেন হঠাৎ ঘাটে বাজলো ডঙ্কা,
পালের পিঠে পাল উড়িয়ে জাহাজ ভিড়লো গঙ্গায় !
ডাঙায় নেমেই কী তুক্ করলো যাদুকরের কাঠি :
কাপাস খেতে আপিস হ'লো, মাটি ঢাকলো পাপোষ পরিপাটি।
যত ছিলো কুকুর-চাটা শেয়ালকাঁটার বন
কেটে কখন করলে সিংহাসন।
খেতাব মিললো রামবাবুদের, নেচে উঠলো নটী।
হড়মবিবির খড়ম হ'লো, কলুর জুটলো সায়েববাড়ির চটি।
ক্রমে-ক্রমে সেবার
বাবুসকল সুযোগ পেলেন হেদোর জলে ইচ্ছে-সাঁতার দেবার।
সমাচারের আরসি ফলায় রকম-রকম স্তম্ভ :
ক্ষণে তুষ্ট, ক্ষণে রুষ্ট, বাবু হ'লেন বড়োই হতভম্ব।

কিন্তু বলো, কী করা যায়, দিনতো সমান যায় না।
হবা-গবার গলায় উঠলো নিত্যনতুন বেয়াড়া সব বায়না।
যা হয় না তাই হ'লো শেষে, এসে পড়লেন স্বাধীনতা :
সাঙ্গ হ'লো এতকালের তাধিন তাধিন তাধিনতা।
আপদগুলো, তখন হ'লো মালুম,
পালায়নি কেউ যখন কিনা বাঘ বললে হালুম।
নাম ভাঁড়িয়ে কুমির কী সাপ, দেখা গেলো, সবাই আছেন টিকে
ডাইনে বাঁয়ে বাবুর চতুর্দিকে।

গেছেন শুধু রাজার জাতের গুঁপো সায়েবগুলিন,
ফেলে গেছেন স্বাধীন যুগের ডেঁপো এবং ভঙ্গ কিছু কুলিন।
তখন হ'লো মালুম—মলিন ভুঁয়ে,
ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে,
কণ্ঠাগত প্রাণে কেমন ধুঁকছে উপনিবেশী কলকাতা,
হাড্ডিসার স্বদেশী কলকাতা॥

জুয়াড়ীর দুর্বিপাক

(বন্ধুবর শামসুর রহমানের জন্য)

সর্বস্ব হারিয়ে শেষে হতমান জ্যেষ্ঠ জুয়াড়ীকে
নগর ছাড়িয়ে, ছাখো, যেতে দেখা যায়
পুবাণোক্ত অরণ্যের দিকে,
অরণ্যের দিকে।
জলাঞ্জলি দিয়ে সব আত্মশ্লাঘাভরা উচ্চাশায়,
অলক্ষ্য অলীক কোনো অধিক জুয়োব টানে
ধীর পায়ে বনবাসে যায়,
ছাখো, লোকটা বনবাসে যায়।
কিন্তু পথ ফুরোয় না, ধরাতল ইদানীং অরণ্যবিহীন
সহসা হয়েছে আজ, বৃক্ষেরা দিগন্ততলে লীন।
কেটেকুটে সব কাঠ বণিকেরা তুলে নিয়ে ট্রাকে
কারখানায় চ'লে গেছে, ফেলে ওই জ্যেষ্ঠ জুয়াড়ীকে
বড়ই বিপাকে।
বনবাস হ'য়ে ওঠা এক মহাবিশ্ববিদ্যালয়
একালের জুয়াড়ীর কপালের লেখা হয়তো নয়।
অবশ্য নগরে যদি স্ফীতোদর পুরবাসীগণ
যথার্থই মেতে ওঠে বনমহোৎসবে,
হয়তো একদিন ফের ধরাধামে অরণ্যানী হবে।

এবং, শুনেছি জনরব,
সে-অরণ্যে সপ্তাহান্তে বনবাস অবশ্য সম্ভব।

দ্রৌপদীকে পণ রেখে, তা'হলে আর এক দান পাশা
কী এমন হবে সর্বনাশা ?

ক্রিটিক

রেতে মশা, দিনে মাছি :
প্রসিদ্ধ ঐতিহ্যে আছি
      ডিহি কলকাতায়।
প্রগতিরও মাত্রা নেই থেমে,—
খনে নেমে, খনে চ'ড়ে
সন্ধ্যে হ'লে টুক ক'রে প্রায়শঃ
      যখন বিদ্যুৎ চ'লে যায়,
বিপ্লবী বানানে লেপা দেয়াল
যখন আর চোখে হয় না খেয়াল।
জটিল সংকট। তবু বিপন্ন বিশ্বকে ভালোবেসে
স্বকুমার রায় কৃত বিখ্যাত ছাগল
পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে, শিং চুলকিয়ে, একটু কেশে,
      দাঁড়ায় গা-ঘেঁসে।
গলা খাটো ক'রে বলে : 'দেবো নাকি বক্তৃতাটা
      যার বিষয় হচ্ছে ছাগলে কী না খায় ?'
মিনি লেজ নেড়ে অন্ধকারে
      অনুমানে মুখের পানে তাকায়।

আমি তাকে স্নেহ করি, অনুরাগ ভরে শুনি.
      খাদ্যাখাদ্যে অভিজ্ঞতা তার।

হেন বিজ্ঞ জীব দেশে বড়ো দরকার।
একমাত্র সে-ই
টিকটিকি দেখেছে চেটে, ওতে
কিচ্ছু খাবার মতো নেই।

নৃত্যপ্রিয় চিত্তে তাব তবু একটু ঘুসঘুসে অসুখ—
এখনো পারেনি দেখতে চেটে
বস আছে কিনা টি. ভি. সেট-এ।
বিস্তব জাবব কেটে ঠিক কবেছে অগত্যা সেদিন :
নেই ওতে কিসসু ভিটামিন।
হয়তো বা খেতে টক, হয়তো বা কষা।
তাব চেয়ে খাওয়া ভালো দিনে কিছু মাছি আর
রেতে কিছু মশা।

বিচার

'নালিশ বাতলাও'—বললেন ধর্মাবতার,
ব'লে চোখ ফেললেন বুজে।
সিকিখানা স্বদেশী মোমবাতি
উলসে উঠলো পিত্তল পিলসুজে।
ঘটনার কাল :
ম্লেচ্ছ কোনো আটাত্তর সাল।
ফরিয়াদি সরফরাজ। বেজায় গবম, হৈ চৈ।
পেয়াদা পেশকার নাজির
সব হাজির।
কিন্তু আসামী কে? আসামী কৈ?

ললিত পালিত তাঁর কেশভার নিয়ে

সরকারি উকিল হাঁকলেন : 'স্যর,
অবিলম্বে এর একটা বিহিত দরকার।
কে আসামী কে না জানে, অথচ ধরা শক্ত
লোকটা চ্যাপ্টা না গোল, ভক্ত না বিভক্ত,
এমনি ধূর্ত।
পাখা থাকলে আকাশে উড়তো।'—

—'নালিশ বাতলাও'।

—'স্যর, গৌড়বাংলার শ্রীশ্রীপাদপদ্মপাটে
ফুলটুল না ছিঁড়লেও, চর্মচক্ষে অনেকেরই দেখা,
এই মূঢ় আড়ে-আড়ে হাঁটে।
হয়তো বা বাগ্‌দেবীর মাঠে
বেকানুন ঘাসটাসও কাটে।
পদ্মকে ভাবে পদ্য, এইতো বানানজ্ঞান!
আ-মরি-সুন্দর নিয়ে অবসর মতো
একটু ধ্যানট্যান পর্যন্ত শেখেনি, এ্যাত্তো বাজে।
হাজির হ'লে, হুজুর, ওকে শুধোন—
ও কি চূণ দিয়ে দাঁত মাজে?
গভীর সব ছেঁদো কথার ব্যাপক
কোনোদিন কি হয়েছে বিজ্ঞাপক?
জানে কিছু ধানভানার রীত?
জানে, কখন গায় শিবের গীত?
কৈ?
সূক্ষ্ম বা দুর্নিরীক্ষ্য বিষয় নিয়ে করুক দেখি প্রচণ্ড রৈ রৈ
(যেমন আমি করি)। স্যর,
এর একটা বিহিত দরকার।
ব্যাপার ফ্যালনার নয়,
একটানা তর-প্রত্যয় অব্দি শুরু।

উচ্চে তুলতে আজ্ঞা হোক
বাগ্‌দেবীর সাহিত্যিক ভুরু।'

সবাই বললেন শুনে বাহবা ও বেশ।
ধর্মাবতার এবার সত্যি জেগে উঠে চোখ মেললেন : 'শেষ ?'

গাধা

(মীরা বেন্‌কে চিঠিতে বাপু নিজের শরীরকে বলেছিলেন 'this ass')

অনেক গ্যাছে সওয়া, অনেক বিশদ হাসি মস্করা :
আর পারিনে, গাধাটাকে গেলোই না যে বশ করা।
একটা কথায় কান পাতে না, কেবল থেকে-থেকে
কিম্ভূতকিমাকার স্বরে হঠাৎ ওঠে ডেকে।
কেন ডাকে, কাকে ডাকে, ভারি শক্ত ধরা।
হয়তো ইচ্ছে আমার নিন্দে বিশ্বে রাষ্ট্র করা।

পাঁচটা নয়, সাতটা নয়, ওই তো সবে ধন—
কী করবো কন, যখন পারি তুষি,
তাতে যদি জন্তুটা রয় খুশি,
সময়-অসময়ে যদি না-করে বিরক্ত।
হায়রে, ভাবা যত সহজ, করা ততই শক্ত।

জন্ম থেকেই সঙ্গে আছে সেঁটে।
অখিল খিদে এবং যতো দুষ্প্রবৃত্তি পেটে।
সময়-সময় রসিক সাজে, শুনে খাদের ঋ
রোগা লেজটা নাড়তে থাকে, গা করে রি রি।

কত বুঝিয়েছি, ওরে, স্বভাবটা পাল্টাস,

খাসনে অমন খচমচিয়ে যাচ্ছেতাই খাস :
সুনীল দাস আঁকবে না তোর ছবি
যদ্দিন না ঘাড়-বেঁকানো গোঁয়ার ঘোড়া হবি।
যা-দেখি তোর মতিগতি,
হবে না তোর কোনোকালেও পদোন্নতি।
শুনে, বিজ্ঞ হেসে তিনি ছড়ান হাত-পাগুলো,
গায়ে ঘসেন, মাথায় ঘসেন সাত রাজ্যের ধুলো।

সান্ত্বনা এই, শেষের সে-দিন থাকবি রে তুই প'ড়ে
যেদিন আমি কুলুপ দেবো মাটির এ-ঘরদোরে।
হবে চিরকালের ছাড়াছাড়ি
দেবো যেদিন কুলহারা সেই অগাধ নদী পাড়ি।

বিবাদ শুনে মজা যাঁদের—যান না কেটে পড়ুন।
দেখছেন তো ঘরোয়া এই খিটিমিটির শেষটা কিছু করুণ।
মশাইগণ, হাঁ ক'রে যে তাকাচ্ছেন বড়ো!
(গাধারে, এই বাবুদেরকে একবারটি গড় করো।)
কর্তা বুঝি ব্যাজার হ'লেন? দেহ থাকলে হবে না অশ্লীল?
বন্ধ রাখুন গিয়ে মশাই নিজের-নিজের শোবার ঘরের খিল।
কার না-আছে পোষা গাধা? আপনি বুঝি বাদ?
নজ্জা ঝেড়ে বলুন সায়েব, আপনার সেই তেনার কী সংবাদ।

কোনো স্বপ্ন ফেলে রাখতে নেই

পুরানো পাবলিক বাসে আসা যেতো ভিন্ন পাড়া থেকে। উঠে গেলো।
সাতসকালে সেই কখন দাড়ি কামিয়েছি, এখন আর ফিটফাট লাগছে না।
ভোরে উঠে টেলিফোনে দু'তিনটে বক্তৃতা করা ছিলো, চায়ের কাপটা দেখি
সেই ফাঁকে হ'য়ে গেছে বাসি।
তারপর দরজা ঠেলে বেরিয়ে এসেছি। একজোড়া নতুন হাঁটু, পুরানো সম্বল,
ঢাকা ছিলো ক্রিজরাখা পাৎলুনের নিচে। ছেঁড়েনি বা সেলাই খসেনি।
পুনপুন নদীর জলে শেষ তাদের চান করাই উনিশ কি বিশ সাল আগে।
এতদিনে সে-নদীটা কোথাও কি আছে? মাতাল বৈশাখী-লাগা খাড়া সব
তালগাছের হাওয়া দেখি বয় না আজকাল, শুঁড় নেড়ে সারবাঁধা ডেয়ে-পিঁপড়ে
ওঠে না হাঁটুতে। গলিতে দাঁড়িয়ে ভাবি জীবনের সার সত্য কথা:
কোনো স্বপ্ন ফেলে রাখতে নেই। রাখলেই ধুলো জমে, ঘাসে ঢাকে, মগজের
পাইকা হরফগুলো চেটে দেয় ভুল মাকড়সাতে। তখনি মালুম হয়—দিগরের
সব নদী খাল বিল শুকিয়ে গিয়েছে, উল্টোপাল্টা হ'য়ে গেছে চেনাজানা সব
রাস্তাঘাট। মগজে মাকড়সা লাগলে জগতের সবই বিভীষিকা।
পাখি পোষা শখ ছিলো এককালে কখনো—
বাত ধরলো পাখির ডানায়। সে-রোগে ওষুধ নেই, বৃথা খরচা ডাক্তার লাগিয়ে।
ভেবে তাই ঠিক করেছি পাখিদের ছবি পোষা ভালো, সারবন্দী ছবির খাঁচায়।
জ্যান্ত না হওয়ার কিছু স্থবিধে রয়েছে, এক পয়সা বাজে খরচা নেই।
আর্টস্কুলে ফেলে দেওয়া তুলি এনে পোঁচ দিলেই চলে। চেঁচায় না খিদে পেলে,
রঙটা আপিস থেকে চেয়ে-চিন্তে আনা। অথচ ফিঙের ছবি করতে গিয়ে
কী ক'রে যে হ'লো দাঁড়কাক! অগত্যা ছুটির দিনে লুকিয়ে খাঁচার
ভেজানো দরজাটা মুছে হাট ক'রে খোলা দরজা আঁকা দরকার,
কাকটা যাতে এক ফাঁকে পালায়। ভালো হ'তো শ্যামা পুষলে,
পড়ালে যে পড়ে—রাধেকৃষ্ণ ব্যাবো রামায়ণ। তেমন শ্যামা কি আঁকা যায়?
টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে, ভিজতে চাইনে, চলি। তোলা যাক ধুলো ঘাস
মাকড়সার খুচরো বাচালতা। পাৎলুনের ক্রিজ রেখে, নতুন পা-জোড়া প'রে,
কাল না হয় দেশে চ'লে যাবো॥

প্রতিধ্বনি

১

দিনের আলো নিভে এলো ;
এখন সময় কৃতজ্ঞতার ।
এখন শুনি প্রতিধ্বনি
হাল কবিদের নতুন গাথার ।
সাবেক প্রতিশ্রুতিগুলো ঝুল-কালিমাময়,
যেতে-যেতে তবু একবার ফিরে দেখতে হয় ।
ঝাপসা ছবি চোখে ভাসে : কোকিল পেড়ে ধুতি,
চুনট করা পাঞ্জাবি গায় তাকায় ইতিউতি
সেই লক্কা পায়রাটি যে ছিলো লোকের চেনা ।
ভাবতো সবাই—একদিন তার শুধবে সে সব দেনা ।
কিন্তু, হায়রে, কিন্তু—
আত্মপ্রতারণাতেই সে কাটালো রাতদিন তো ।
এখন দেখে চৌদিকেতে ঘূর্ণিঘাটের জল !
ও তুই যাবার আগে খুলে দ্যাখা স্মৃতির ট্যাঁকে তোর
কী জমলো সম্বল ।
দ্যাখা, প্রাণে কিসের দহণ,
বিশুদ্ধ পঞ্জিকার মতে আকাশে আজ যখন পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ ।
উসকে দিয়ে সলতে
ভেবে দ্যাখ তুই পারিস কিনা বলতে—
আগুন কাকে রাখে, এবং আগুন কাকে মারে ।
নয়তো কালের চিতায় পুড়ে একমুঠো ছাই হ'য়ে
লুপ্ত হবি জগৎপারাবারে ।

২

এ সময়ে মানুষের অল্পসল্প জ্বর আসে, সে-কারণে তার
নিতান্ত নিজস্ব একটা ঘর থাকা দরকার,
যেখানে আড়াল থেকে শোনা যাবে অমাবস্যার

ভিতরে যে-নদী কথা বলে শালবনে,
যে-কথা সে একলাটি শোনে,
দেখতে পায় রমণী উদ্যানে গেলে ঝরে কত রূপ,
যখন জলপাই পাতা খসে টুপটুপ।
অথবা প্রখর কোনো গ্রীষ্মের দুপুরে
পথে ঘুরে-ঘুরে
চুলখসা ভালোবাসা ঢুকে পড়ে ওই
ভুল বাড়ির দরজা দিয়ে, ডেকে বলে—'কৈ ?
এ-বাড়িতে কেউ নেই নাকি ?'
মিথ্যে ডাকাডাকি—
'সহেলি, প্রাণের সখি, সই,
ভুল ডেরায় কাকে তবে মনের কথা কই ?'

আমি তো থেকেও নেই, আমার সর্বস্ব কেটেকুটে
ছারখার করেছে নীল কীটে।
বৃথা তালি দেওয়া ছেঁড়া জামাটার পিঠে।
কেউ বলে—'উৎসে যাও ঝরনার গুহায়,
ভাঙো গে পাষাণ কারা', আমি বিপরীত
শব্দ হ'য়ে বেঁচে থাকি, জগতের হিত
কিসে হবে ভেবে পাইনে। উষাকালে ঝাউয়ের শাখায়
তবুও প্রত্যহ দেখা যায়
সূর্যটি ওঠেন পরিপাটি,
হাতে প্রাতর্ভ্রমণের লাঠি।

একদা উর্বশী

তাকে চেনা ভার :
রোদনরূপসী নারী,
অনুমানে বুঝতে পারি
করেনি সংসার।
তাকে চেনা ভার।

আপাতত মনে হয়
মগ্ন কিছু গবেষণা নিয়ে।
কী জানি ভেঙেছে কিনা বিয়ে

নির্মম নির্দয় কোনো
ভাস্করের নিজ হাতে গড়া
একবেণী ওই স্বয়ম্বরা,
উত্তমা
        শোভনা
                বামা
অমলিনা একদা উর্বশী—
কখনো কি ছিলো না ষোড়শী ?
অন্ধকারে কুয়াশায়
মুছে গেলে চির চেনা পথ,
ক্ষয়ে গেলে দিগ্বিদিকে
বিচক্ষণ পাহাড় পর্বত,
অপলাপী অবেলায়
তাকে শুধু করা কেন দোষী ?

হ'তে পারে—
ছড় টেনেছিলো ভুল তারে।
হ'তে পারে—
জাহাজ আসেনি ফিরে
বড়ো ঝড়ে, অকূল পাথারে।
প্রণয়ে পাশার দানে,
হ'তে পারে, হয়েছিলো হার।
ভালো ক'রে চেয়ে ছাখো,
আজ তাকে ফিরে চেনা ভার।

হার সে মানেনি, ব্যাগে
পুরেছে রুমাল,
আপনি শুকিয়ে গেছে
ভেজা চোখ গাল।
ফিরেছে আপন দুর্গে
ভাবনার গবেষণাগারে :
কালরাত্রি যদি কাটে,
মৃত্যু ছেনে যদি বাঁচতে পারে।
কী ভালো? বাঁচা, না মরা?
কাকে মালা দেবে স্বয়ম্বরা?

জীবন-বীক্ষণী যন্ত্রে
তাকায় উদ্‌ভ্রান্ত বুঝি,
হাড়ে শীত, বক্ষে ম্লানালোক।
জঞ্জাল-টুকরিতে গেছে
তীরের ফলায় গাঁথা শ্লোক।
উঠে গিয়ে কী ভেবে হঠাৎ
ডেটলের শাদা জলে

মুছে ফেলে আঁষটে মুখ হাত।
লেন্সের তলায় আলো জ্বলে,
দৃষ্টিতে একে-একে ফলে
দূর বসন্তের নষ্ট
মুঠো-মুঠো ফুলের পরাগ,—
পরাস্ত প্রাণের ক্ষীণ দাগ,—
কত যুগযুগান্তের বাসি,
মৃত্যুর পাতাল ফুঁড়ে তোলা
রঙ ভোলা, সব গন্ধ ভোলা,
নিষ্ফল ফসিল রাশি-রাশি।
নোট নিতে খোলে নোটবই।

ক্ষীণমধ্যা এ-নারীর
এ-জীবনে হার হ'লো কই?

কে জানে উত্তর? প্রতিদিন
উদাসীন সূর্য যান পাটে।
দিনান্তে খোয়াইতে শুয়ে ব'সে
উটকো লোকটা
শুঁটকো লোকটা
দাঁতে ঘাস কাটে।

যুগোশ্লাভ কবিতার স্মৃতিতে :

১ লড়াই থেকে পালিয়ে

রাত-চাপা-পড়া মুমূর্ষু পল্লীটি,
তাড়া খেয়ে, লড়াই পালিয়ে, যেখানে ঢুকে
আড়ালে একটা দেয়ালে ভর রেখে
দম নিচ্ছি আমি।
অবিরল জল ঝরছে কোনো গোয়ালে রাখা জালায়।
হঠাৎ খেপে গিয়ে, উলঙ্গ একটা বেড়াল
চাঁদের বুকে হামা দিচ্ছে বহুক্ষণ।
স্তব্ধতার প্রতিধ্বনি ফিরছে দূর থেকে।
ক্রমে রাত বাড়ছে।
আমি প্রাণপণে লড়ছি যাতে হাঁটু দুমড়ে ব'সে না যাই, খাড়া থাকি।
বারবার ভয় তবু শাসাচ্ছে
        আমার ধৈর্যকে খুন করবে,
        ফাটিয়ে দেবে কানের পর্দা,
        পিষে ফেলবে হাড় পাঁজরাগুলো।
তলায় দেয়াল ঘেঁসে ফুটে রয়েছে ভায়োলেটগুচ্ছ,
ভেজা-খড় দেখছি লেবু তলায় ডাঁই করা,
জ্যোৎস্নায় ছড়িয়ে আছে চূর্ণ-চূর্ণ কাচ।
উঠোনে ঘাস।
হৃদয়ে ছাই॥

২ তুমুল সূর্যাস্তের পরে

তুমুল সূর্যাস্তে শুরু হ'য়ে
নিঃস্ব গ্রহতারার আলোতে মিটমিট করছিলো সন্ধ্যাটি
চেনা লাগছিলো না কত কিছু।

যাত্রী ফেলে রেখে
হঠাৎ ট্রেনগুলো পালিয়ে যাচ্ছিলো স্টেশন থেকে।
সিনেমা-থিয়েটরে ভিড় ছিলো না।
রাস্তায় চেনালোকের দিকেও
        ফিরে তাকাচ্ছিলো না কেউ।
ঝাপসা আলোয় দ্রুতপায়ে ঘরে ফিরছিলো সবাই
        তাড়াখাওয়া ত্রস্ত ইঁদুরের মতো।
ক্বচিৎ কাউকে দেখাচ্ছিলো তুখোড় সার্জনের
        ছুরিকাঁচির মতো ঝকঝকে,
ক্বচিৎ কাউকে দুর্লভ মাছ বা পাখির কঙ্কালের মতো লাগছিলো।
উটকো একটা লোক
একলা সাঁতরে চ'লে গিয়েছিলো মাঝনদীতে,
        জলে বিছানো চাঁদের সড়কটাকেই তাক ক'রে হয়তো বা।
আসন্ন একটা বিপদের সংকেত ছিলো চারদিকে।

অবশেষে
মধ্যরাতে
ওপারের বন থেকে বেগে বেড়িয়ে এলো ঝড়,
আমাদের জানলা-দরজার পাল্লাগুলো,
        ছাদটাদ সব
তছনছ তোলপাড় ক'রে দিয়ে চ'লে গেলো॥

ইরাক

তৃষাতুর মরুভূমি, কঠিন পাহাড় দুই পাশে।
ভরা গ্রীষ্মে, খর চৈত্র মাসে
কাশ্‌বিন, কের্‌মানশা ছেড়ে আরব্য ইরাকের পথে
কবি গিয়েছেন দেখে বেহিস্তানী পাহাড়ে পর্বতে
দারায়ুসী শিলালিপি। কানিকিন রেল ইস্টিশনে
আদাব আদাব জনে-জনে।

সে-ও ছিলো গন্তব্য বাগদাদ ;
ছিলো আড়ম্বরশূন্য আরবীয় বীর্যের স্বাদ।
বেদুইন তাঁবুতে পাতা কার্পেটে বসেছেন কবি :
উজ্জ্বল বন্ধুতার ছবি।
অবশেষে হাল্কা পল্‌কা সসম্ভ্রম ডাচ বায়ুযান
কবিকে স্বদেশে আনে, পৃথিবী করেনি খানখান।

রবীন্দ্রনাথের দেখা সে-বনেদী সৌজন্যে ভরা
নম্র দক্ষ প্রাচীন ইরাক
কখনো হবে না ধ্বংস। তুরী-ভেরী-বাজানো হাঁকডাক,
সব বিষ, স্কাড্‌, পেট্রিয়ট
সাঙ্গ হ'লে, তবু থেকে যাবে
ধবল শিমূমে লেখা উদাসীন মানুষের পট,
থেকে যাবে যুবকের নিষ্পলক চেয়ে থাকা যুবতীর চোখে
হৃদয়-ওপড়ানো অন্য মানুষেরই সুখে দুঃখে শোকে।

গ্রন্থপরিচয়